শিব-মহাদেব

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি

boierpathshala.blogspot.com

শিব-মহাদেব

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

boierpathshala.blogspot.com

শিব-মহাদেব

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি

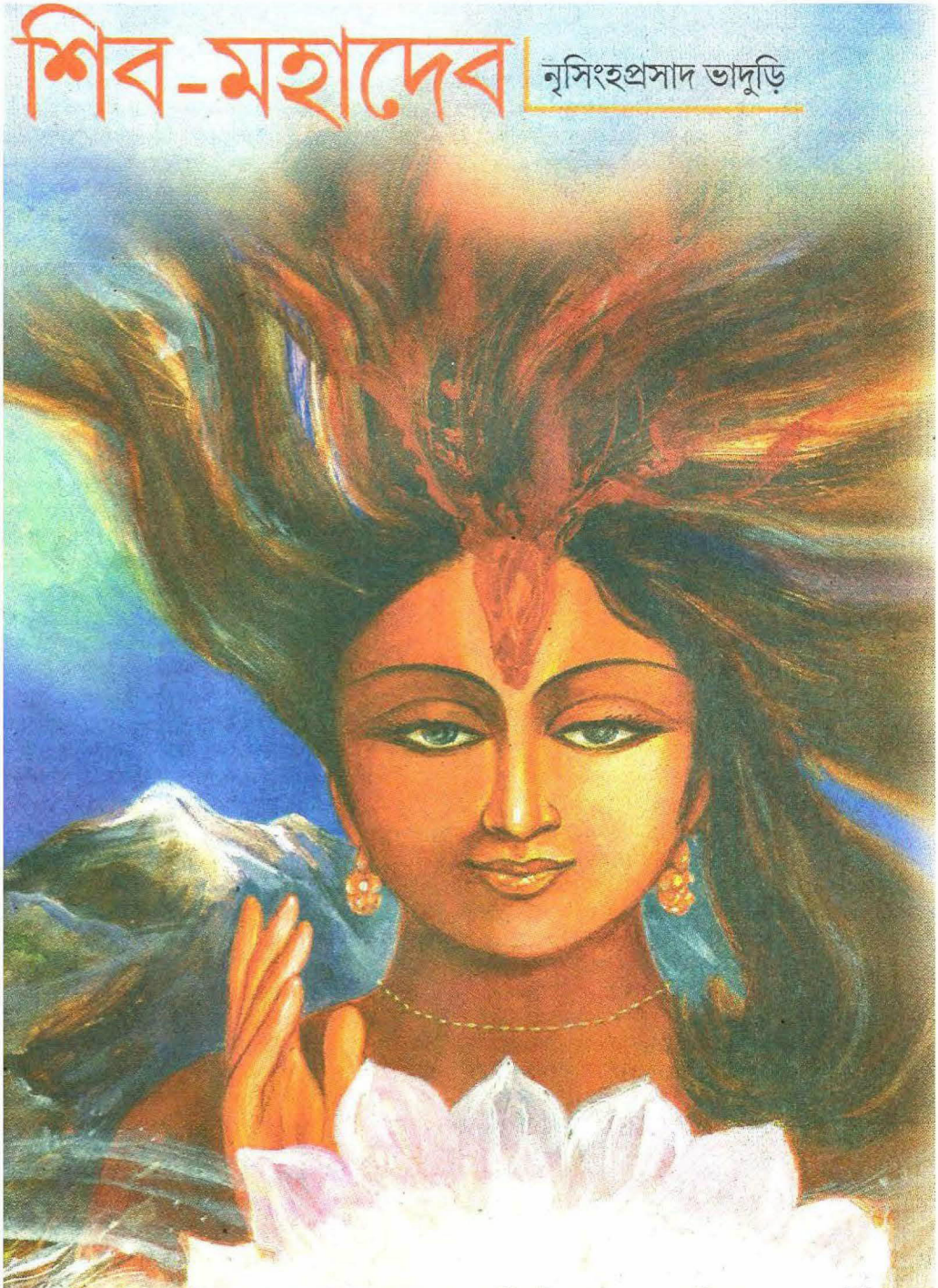

একটি নয়, দুটি নয়, অন্তত আট-দশ পুরুষকে দেখে আমি হিংসায় ভুগেছি; এমনকী সেটা কোনও গ্রামের বাড়িও সবসময় নয়, গ্রাম-শহরও নয়, এই কলকেতা শহরেও আমি অন্তত জনা তিন-চার পুরুষকে দেখেছি, যাঁদের জীবনযাত্রার প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করে অনন্ত অসূয়ায় তাঁদের গুণের মধ্যেও আমি দোষ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি এবং তা আমারই কল্পিত কারণবশত। অথচ কার্য-কারণের বৈজ্ঞানিক বিচার করেও আমি এই ধন্ধের কোনও সুমীমাংসা করতে পারিনি এবং অবশেষে এও বুঝেছি যে, বৈজ্ঞানিক তর্কযুক্তি সর্বক্ষেত্রে সমাধান দিতে পারে না। আমাদের গাঁয়ের যামিনীরঞ্জন ঘটক—তাঁকে কোনওদিন আমি চাকরি করতেও দেখিনি, অর্থ উপার্জনের জন্য অন্যান্য পরিশ্রম-ক্লিষ্ট উপায়ের মধ্যেও তিনি যেতেন না। তবে তাঁর একটা বড় গুণ ছিল—তিনি ভোজনকালে অন্নের পরিমাণ নিয়ে যত চিন্তিত হতেন, ব্যঞ্জনের আস্বাদন নিয়ে তিনি এতটুকুও চিন্তিত হতেন না।

boierpathshala.blogspot.com

ফলত গলাধঃকরণের মধ্যেই তাঁর পরম তৃপ্তি হত। বন্ধুজনেরা তাঁকে তাঁর নাম নিয়েই 'কনোটেটিভ্‌লি' খ্যাপাত—তার কারণ তাঁর স্ত্রী ছিলেন দুটি, বাড়ির গেরস্থালি এবং নিরন্তর যামিনী-যাপন— দুটিই এমন নিপুণ প্রতিযোগিতায় তাঁরা সম্পন্ন করতেন যে, যামিনী-রঞ্জনের অবান্তর রতিফল ছিল অনেক, তাঁর পুত্র-কন্যার সংখ্যা দুয়ে মিলে আট-নয় জন।

অথচ কী আশ্চর্য যে, এতগুলি পুত্র-কন্যা থাকা সত্ত্বেও যামিনীরঞ্জনের বহুশাখ বাৎসল্য-ভাবনার মধ্যে অদ্ভুত এক নিশ্চিন্ততা ছিল। তিনি কখনওই দুঃখিত হতেন না। বরঞ্চ তাঁকে নিয়ে অন্যের দুশ্চিন্তা হলে তিনি সেই প্রাবাদিক বচন উদ্ধার করে বলতেন—জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। তিনি যে আহার সবসময় দিতেন, তা নয়। কিন্তু সেকালের দিনে পরান্নভোজনে অনেকেই কুণ্ঠিত হতেন না। নিজের পৈতৃক জমি-জমার যতটুকু ধান-চাল এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণবশত পরান্নের কল্যাণে তাঁর সাতষট্টি বছরের পান-চিবোনো নিশ্চিন্ততা আমি দেখেছি, এমনকী তাঁর মেয়েগুলিরও বিয়ে হয়ে গেল বিচিত্র উপায়ে। তার ভালো-মন্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু তিনি বলতেন— অত ভাবলে চলে না। আমি বড়লোক ধনী নই যে, বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে দেব। আমি ছেলেমেয়েদের আনন্দে থাকতে শিখিয়েছি, শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও আনন্দটুকু যেন না যায়। এই তো উপনিষদের কথা— আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে— আনন্দ থেকেই তো মানুষ জন্মায়; আনন্দের দ্বারাই সে বেঁচে থাকে, আর বিনাশের সময় সে আনন্দের মধ্যেই বিলীন হয়— আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

সত্যি বলতে কী, এই যে আনন্দের বোধ— এই বোধটা কিন্তু অনেক জৈব রসায়ন অতিক্রম করে আসে। অনেক শুভাশুভ, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ অতিক্রম করে আসে। আমি কিন্তু ওই কর্মহীন, আপাতদৃষ্টিতে অপদার্থ, মানসিকভাবে স্থবির যামিনীরঞ্জনের প্রশংসা করে তাঁর জীবন-যাপনের পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য কোনও সুপরামর্শ দিচ্ছি না। কেননা সংসারে জড়-ভরত হয়ে থাকাটা অত্যন্ত কঠিন এবং একইরকম কঠিন যামিনীরঞ্জন হয়ে ওঠা। আমার সহৃদয় পাঠকেরা ভাবতে আরম্ভ করেছেন নিশ্চয়ই যে, এ কেমন এক প্রকল্প, যেখানে শিব গড়তে বাঁদর গড়ার কাজটা এত তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয়ে যাবে। আসলে শিব গড়ার কাজটা খুব সহজ নয় বলেই আমাদের শিব-ভাবনাও প্রায়ই বাঁদরামিতে পরিণত হয়। আমাদের পৌরাণিকেরা নানান গল্পগাথা, নানান কীর্তিকথা সাজিয়ে যেভাবে শিবচরিত্র, এমনকী যেভাবে তাঁরা শিবের চেহারাটাও তৈরি করেছেন, সেটা এক চরম বৈপরীত্যের সমাহার, চরম বিরুদ্ধ বস্তুর একত্র সমাপতন। আর এই সমাপতন তখনই সম্ভব, যখন বোঝা যাবে এই বিরুদ্ধতা, এই যুগপদ্ভাবের ওপরে আছেন তিনি। শিবের ক্ষেত্রে, লক্ষ করে দেখবেন শুধু শিবের ক্ষেত্রেই, এই বিরুদ্ধতা এবং এই যৌগপদ্য একেবারে চেহারা থেকে স্বভাব পর্যন্ত একইরকম।

আমাদের শাস্ত্র-কাব্যে ভগবান শিবের একটা লৌকিক চেহারা আছে, তাঁর থসথসে ভুঁড়ি, মাথায় জটা, গায়ে ভস্মমাখা, সে এক অদ্ভুত ন্যাদোস চেহারা। আবার এই শিবই নটরাজ, তাঁর সুন্দর, নির্মেদ পৌরুষ বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেন ছন্দ জাগিয়ে তোলে। একদিকে শিব চরম বৈরাগী, আর এক দিকে তাঁর প্রেমের সঙ্গে কাম-পরায়ণতা দেখে কার্তিক-গণেশের মতো ছেলেরাও প্রায় হাততালি দেয়। তাঁর কোনও সংসার নেই, অথচ কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী সবাইকে তাঁর পুত্র কন্যা বলে জানি। এমনকী তাঁর বাহনটি নিয়েও বিতর্ক— সিংহ নয়, হাতি নয়, হংস-ময়ূর, তাও নয়, শিবের বাহন ষাঁড়—তা সে ষাঁড়ও নাকি বৃদ্ধ— কবিরা বলেন সেইরকম— সম্পদের সীমা নাই বুড়া গোরু পুঁজি। তবে শুধু ষাঁড়ের কথাই বা বলি কেন, স্বয়ং শিবকেই কতবার বৃদ্ধ বলা হয়েছে নানা কারণে। কিন্তু ঋগ্‌বেদে যদি রুদ্র-শিবকে বৃদ্ধদের মধ্যেও প্রবীণতম বৃদ্ধ বলে থাকে— তবস্তমঃ তবসাম্— তবে তার কারণ অন্য, কিন্তু শিবের বিবর্তনে এই বঙ্গদেশের অজস্র মন্দিরে তিনি 'বুড়োশিব' হয়ে গেছেন, তার কারণ শুধু বৃদ্ধত্ববোধক শব্দটা। আসল ঘটনা হল— শিবকে তাঁর পরিচিত 'ট্রেইট্'-গুলো দিয়ে চেনা যায় না। সমস্ত বিরুদ্ধবস্তুগুলি নিজের চরিত্রের মধ্যে গ্রহণ করার ফলে তাঁর ক্রোধ শান্তির চেহারা নেয় মুহূর্তে, বৈরাগ্য কামনার মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয় এক লহমায়, আবার কামনাও এত শীঘ্র বৈরাগ্যে উপনীত হয় যে, শিবের অনেক কিছুই শেষ পর্যন্ত মধুর-বিমল হাস্যরসে পরিণত হয়। বিশেষত পুরাণকারে এই কবিরা ভগবান শিবকে নিয়ে যত আনন্দ পেয়েছেন আর কাউকে নিয়ে এত আনন্দ পাননি।

সবচেয়ে বড় কথা, এই এক দেবতা যাঁর সঙ্গে কোনও দেবতার ঝগড়া নেই, তিনি সকলকে ভালোবাসেন, সবাই তাঁকে ভালোবাসে এবং ভালোবাসে এই জন্য যে, সমস্ত সমস্যায়— দানব-মানব-দেবতা— সবার সমস্যায় তিনি নিজেই মস্ত এক সমাধান— অথচ নিজের সম্বন্ধে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধেও তিনি এত নিস্পৃহ, এত উদাসীন, যে সেটাতেও নির্মল হাস্য ছাড়া আর কিছুরই উদ্রেক হয় না। দেবতা বা দেবতত্ত্বের মতো এতটা 'সিরিয়াস' নন বলেই কবিরা বারবার তাঁর হাসিটিকেই আমাদের জীবরক্ষার ওষধির মতো উপহার দিয়েছেন— শ্রেয়াংসি বো দিশতু তাণ্ডবিতস্য শম্ভোঃ/ অম্ভোধরাবলি- ঘন-ধ্বনিরট্টহাসঃ— আমার কবি লিখেছেন— পার্বতীর মুখের পানে ধূর্জটির হাসি। সত্যি বলতে কী, বেদ-উপনিষদের উপরিকাঠামো বজায় রেখে যে-সব কুলীন দেবতা আমাদের দেশে বিরাজ করছেন,তাঁদের নাগাল পাওয়াই খুব ভার। কিন্তু এই সেই দেবতা যাঁর বৈদিক কৌলীন্যের প্রতিস্থাপন ঘটেছে লৌকিক মধুরতায়। তাঁর চেহারা, চরিত্র, স্বভাব, এমনকী তাঁর বিকারগুলিও যেন আমাদের খুব চেনা, আমরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারি নির্দ্বিধায়, তিনি যেন আমাদের গ্রাম-শহরের ঘরের বারান্দায় বসা সেই ভুঁড়ি-ভাসানো লোকটা—যে নাকি অল্পবয়সি স্ত্রীর গালমন্দ শোনার পরেই হাসিমুখে বলতে পারে— ছেলেপিলে ঘরে নেই তো, এটটু কাছে এসে বসো দেখিনি।

ঠিক এইরকম একটা সহজ-সরল পরিবেশের মধ্যে থেকেই আমার শিবের কথা বলতে চাই। এখানেও সমস্যা হল— ঈশ্বরের অবতার হিসেবে যাঁদের আমরা কাছে পেয়েছি, তাঁদেরও একটা জন্ম-কর্ম আছে, একটা অপাদান-উপাদান আছে, শিবের কোনও অবতার নেই, তিনি একেবারে সোজাসুজি আমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন প্রলয়ের দেবতা হিসেবে। অথচ বেশিরভাগ সময়েই তাঁর কোনও প্রলয়-মূর্তি বা প্রলয়-নাচন আমরা দেখি না। শিবের অনন্ত কাহিনি তাই বড় খাপছাড়াভাবে মহাভারত-পুরাণগুলি এবং মহাভারত-রামায়ণের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সেগুলি এক জায়গায় এনে কোনও নির্দিষ্ট একটি অনুক্রমে শিবকে সাজিয়ে দেব, তেমন উপায়ও নেই। কাজেই যেমন খাপছাড়া এই শিব, আর যেমন ছন্নছাড়া তাঁর জীবন, আমরাও তেমনই খাপছাড়া ছন্নছাড়া-ভাবেই শিবের পরিচয় দেব। তাতেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে মিলে যাবে পোড়ো বাড়ি। মিলে যাবে রুদ্র-তাণ্ডবের সঙ্গে শিব-সত্য-সুন্দর।

boierpathshala.blogspot.com

॥ দুই ॥

আমাদেরই এক কবি শিবের বিবাহবাসরের একটি বিশেষ মুহূর্ত অবলম্বন করে একটি শ্লোক লিখেছেন। এই শ্লোকচ্ছবিতে দেখা যাচ্ছে—শিব বিয়ে করতে বসেছেন পার্বতীকে। শিবের সঙ্গে আসা যত সব বরযাত্রী, তাঁরা তো সবাই দেবতা। তাঁদের মধ্যে বরকর্তা স্বাভাবিকভাবেই ব্রহ্মা; তাঁর পলিত কেশ, লোক-পিতামহের বৃদ্ধভাব, এবং এই পৃথিবীর আদিস্রষ্টা হিসেবে বরকর্তা হিসেবে তাঁকে বেশ মানাচ্ছে। বিবাহবাসরে বরপক্ষের যত সমস্যা, সেসব ব্রহ্মাই মেটাবেন বলে তিনি শিবের পাশেই আছেন। বিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে, এবার পুরুতমশাই শিবকে বললেন— বংশের পরম্পরা বোঝানোর জন্য সাত পুরুষের নাম লাগবে, নিদেন পক্ষে তিন পুরুষের নাম তো লাগবেই। পুরুত বললেন— দ্যাখো বাবাজি! এটা সম্প্রদানের সময়, তুমি তোমার পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের নাম বলো। কথাটা শুনে শিবের মহাসমস্যা হল। তিনি স্বয়ংভূ দেবতা, নিজেই নিজে জন্মেছেন, পিতা-পিতামহ কার নাম বলবেন তিনি! এমনও নয় যে, তিনি কৃষ্ণ বা রামচন্দ্রের মতো অবতার-স্বরূপে বিচরণ করছেন এই মর্তলোকে। শিবই বোধহয় সেই একতম দেবতা, যাঁর একটা মর্ত-মানুষের চেহারা আমরা প্রায় প্রথম থেকেই পেয়েছি। তাঁর ঘরবাড়ির ঠিকানা আছে হিমালয়ের কৈলাসে। যাঁকে বিয়ে করতে এসেছেন যিনি তিনিও পালটি ঘরের মেয়ে— হিমালয়ের মেয়ে হৈমবতী পার্বতী। বস্তুত দেবাদিদেব শিবের এই মনুষ্যধর্মিতার মধ্যে বিয়ের সময় পুরোহিতের এই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক যে, তোমার বাপ-ঠাকুরদার নাম বলো এবার। হিন্দু বিবাহের সম্প্রদানে বরের এই 'আইডেনটিফিকেশন' নিতান্তই জরুরি।

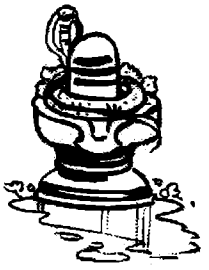

কিন্তু পুরোহিতের প্রশ্ন শুনে শিব তো মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা নিচু হয়ে গেল, তিন কুলে তাঁর কেউ নেই, অথচ বিয়ের আসরে এতগুলি লোকের সামনে পুরুত বাপ-পিতামহের নাম বলতে বলছে— কথয় হরকুলে'লংকৃতে সম্প্রদানে। শিবের বিয়েতে বরকর্তা হয়ে আসা বৃদ্ধ পিতামহ ব্রহ্মা দেখলেন— শিব ভয়ংকর বিপদে পড়েছেন। কিন্তু একে তিনি চতুর্মুখ ব্রহ্মা, তার মধ্যে শব্দসরস্বতী বাক্ তাঁরই মুখ থেকে প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল, কাজেই তিনি কথা কম জানবেন কেন। তাছাড়া শিবকে তো অস্বস্তি থেকে বাঁচাতেই হবে। ব্রহ্মা বললেন— শুনুন পুরুতমশাই। বরের প্রপিতামহের নাম হল বেদকণ্ঠ, পিতামহের নাম উগ্রকণ্ঠ, ছেলের বাবার নাম শ্রীকণ্ঠ, আর আমাদের বরের নাম নীলকণ্ঠ। সরল শিব বড় আনন্দ পেলেন ব্রহ্মার কথা শুনে। বিয়ের আসরে এতবড় অস্বস্তি থেকে বেঁচেছেন বলে তাঁর মুখে ছড়িয়ে পড়ল সরল হাসি। আমাদের কবি লিখেছেন— শিবের এই উদ্ভিন্ন হাসিমুখ রক্ষা করুক সকলকে— শ্রীকণ্ঠানীলকণ্ঠঃ প্রহসিতবদনো পাতু বশ্চন্দ্রচূড়ঃ।

আমাদের সমস্যা হল—এটা তো কবির কথা। কবির কথার কি মূল্য আছে কোনও! আমরা বলি—শিব তো নিজেই এক জীবন্ত কবিতা। আর কবিরা যে শব্দপ্রয়োগ করেন, সে তো এক বৃহৎ পৌরাণিক ভাবনার নিষ্কাশনী থেকে বেরিয়ে এসেছে, তাঁর কথার মধ্যে তো ব্যঞ্জনা আছে। এমনিতে আমাদের পুরাণ-বৃত্তে দেখব— ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—এই তিন মূর্তি আসলে একই দেব-কল্পনার তিনটি ভেদমাত্র— একৈব মূর্তির্বিভেদে ত্রিধা সা। আসলে আমাদের জগৎ ও জাগতিক যা কিছু আছে, তার সবই জন্মায়, চলতে থাকে কিছুদিন এবং অবশেষে তা ধ্বংস হয়। অল্প কথায় এটাই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। এই তিন স্বাভাবিক ঘটনাই তো একটা বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার অন্তর্গত, কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে স্থিতি-পালন, কিংবা স্থিতি-পালনের সঙ্গে ধ্বংস—এগুলি 'কনসেপচুয়ালি' আলাদা বলেই পৃথকভাবে তিনজন দেবতার সৃষ্টি হয়েছে— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। পুরাণ বলে— স্রষ্টাকে কেউ সৃষ্টি করে না, তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেন, এবং পালনকর্তা বিষ্ণু নিজেই নিজের পাল্য— এবং সৃষ্ট জগৎকে তিনি পালনও করেন— স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যঞ্চ পাতি চ। আর জগৎকে যখন সংহরণ করতে হয় বা জগতের জাগতিক প্রক্রিয়াগুলিকে যখন গুটিয়ে নিতে হয়, তখন সেই উপসংহার রচনা করেন মহেশ্বর শিব— প্রলয়-নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ। মহেশ্বর শিব এইখানেই কবিতা হয়ে ওঠেন— প্রলয়ের কাজটাও ঘটে যায় এক বিরাট নৃত্যের মাধ্যমে— হয়তো সেটা তাণ্ডব, কিন্তু তার নান্দনিক মধুরতা কি কম?

বস্তুত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এটা পারেন না। নিজের সৃষ্টিকে, আপন লালিত জগৎকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য চরম এক উদাসীন বৈরাগ্যের প্রয়োজন আছে—সেই চরম বৈরাগ্য মহেশ্বর শিবের আছে বলেই তিনি নৃত্যের তালে তালে এই জগৎকে উপসংহরণ করতে পারেন। এই উপসংহার এবং ধ্বংস ব্যাপারটাকে আমরা সর্বদা ভয় পাই বলেই শিবের প্রথম কল্পনাটাই হল রুদ্রমূর্তি— রুদ্র শিব। আমাদের সর্বপ্রাচীন সাহিত্যমূল এবং ধর্মমূল বেদের মধ্যে মহেশ্বর শিবের রুদ্রমূর্তিটাই আমাদের প্রথম প্রাপ্তি। অথচ সেই রুদ্রের সামান্যতম অবশিষ্টও আমাদের প্রিয় উপাস্য শিব মহাদেবের মধ্যে নেই। এ এক অদ্ভুত পরিবর্তন, রুদ্রের বৈদিক স্বভাব থেকে পৌরাণিক শিবের স্বভাবে এই পরিবর্তনটাকে ব্যাখ্যা করাও খুব কঠিন। আমরা অবশ্য মনে করি—এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে শুধু মানুষের জন্য। মানুষ যেমন অতিক্রুদ্ধ ব্যক্তিকেও স্তুতি-নতি-প্রণয়ে বশীভূত করে কোমল করে তোলে, তেমনই বৈদিক রুদ্রকেও আমরা পৌরাণিক ভালোবাসায় শুষ্ক-রুক্ষ-কঠিন থেকে করুণা-কাতর আশুতোষে পরিণত করেছি। বেদ বলেছে— অনেক স্তুতি করা হচ্ছে তোমার। মধুর থেকেও স্বাদু স্তুতি রচনা করা হচ্ছে এই জন্যই যে, তাতে স্তুতিকারীর বাড়বাড়ন্ত হয়—ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ/ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনম্। কেন এই স্তুতি—যাতে আমাদের ওপর থেকে তোমার সমস্ত ক্রোধ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও, আমরা তোমার অনুগ্রহ এবং সুমতি প্রার্থনা করি।

ঋগ্‌বেদের রুদ্র-কল্পনা থেকেই বোঝা যায়—যেন রুদ্র মানেই ক্রোধ, রুদ্র মানেই রোষ, কিন্তু রোষের ভাবনাটাই রুদ্রের একমাত্র স্বরূপ নয়। বরঞ্চ ধাতু বা ক্রিয়াপদের মূলে রুদ্-ধাতুর অর্থ রোদন করা—যিনি কেঁদেছেন এবং কাঁদিয়েছেন তিনি রুদ্র। খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীর কোষকার-বৈয়াকরণ যাস্ক লিখেছেন— একটা ক্রিয়াপদ নয়, দুটো ক্রিয়াপদ আছে রুদ্র-শব্দের মধ্যে। প্রথমটা রু-ধাতু যার মানে শব্দ করা, বা শব্দ করে কাঁদা। আবার দ্রু-ধাতুর অর্থ যাওয়া, চলা—যিনি শব্দ করতে করতে অথবা কাঁদতে-কাঁদতে দ্রুত চলে যান, তিনি রুদ্র— রোরূয়মানো দ্রবতীতি। যাস্ক কিন্তু শেষাশেষি এটাও বলেছেন যে, রুদ্র যে-অর্থে রোদন করান, সেটা আসলে শত্রুদের রোদন করানো, আরও বিশদার্থে বুঝলে যিনি জগদ্ধ্বংসের মাধ্যমে রোদন করান তিনি রুদ্র।

তবে যাস্কের এই শব্দনিরুক্তির পিছনে তো প্রাচীন বেদ-ব্রাহ্মণের গ্রন্থগুলি আছে। সেখানে শতপথ ব্রাহ্মণ, কৌষিতকী ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণগুলির মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে

boierpathshala.blogspot.com

রুদ্রের জন্মকালীন রূপ সত্যিই ভয়ংকর, কিন্তু একই সঙ্গে তা ভীষণ নাটকীয়ও বটে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা আগে বলি, কেননা এই গ্রন্থেই শিবের ভূতনাথ পশুপতিরূপের প্রথম ব্যাখ্যান যেমন জোটে, তেমনই জোটে পরম দেবতার এক বিপরীত চেহারা, যা নাকি আভরণ-ভূষণ-পরিহিত মুকুট-পরা দেবতার সৌধ-স্বরূপ থেকে একেবারেই আলাদা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাহিনিতে— প্রজাপতি একদিন মনে মনে তাঁর কন্যার কথা ভাবছিলেন নিবিড়ভাবে বসে বসে। শতপথ ব্রাহ্মণেও সেই একই কথা— প্রজাপতি র্হ বৈ স্বাং দুহিতরম্ অভিদধ্যৌ। এই দুহিতাটি কে? না তিনি হলেন উষা। পিতার এই কন্যাভিগমনের নাম মাত্রেই দেশি-বিদেশি সমস্ত পণ্ডিতদের মধ্যেই অগম্যা-গমনের মতো 'ইনসেস্ট্'-এর প্রশ্ন উঠে গেছে। এখানে ভ্রান্তির একটা কারণও আছে অবশ্য। জগৎস্রষ্টা প্রজাপতির মধ্যে যেহেতু একটা পুরুষ স্বরূপতা আছে, অতএব উষাকে নিয়ে এই বিচিত্র কল্পনাটা বেশ একটা মধুর আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে অনেকের মধ্যেই। এঁরা কেউ খেয়াল করলেন না যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতি আপন কন্যাকে কামনা করেছিলেন— এ কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা পঙ্‌ক্তি লেখা হল— দিবমিতি অন্যে আহুঃ উষসম্ ইতি অন্যে। অর্থাৎ এই দুহিতাকে 'দ্যৌঃ' বা আকাশ বলেন কেউ কেউ, আবার উষাও বলেন কেউ।

প্রকৃতির কল্পনায় রঞ্জিত উষা প্রজাপতির এই মিলন ভাবনাকে সত্য ধরে নিয়েই সাধারণ মানুষের মতোই রাগ হল দেবতাদের। তাঁরা বললেন— আমাদের একতমা ভগিনীর সঙ্গে আমাদের পিতা এই অন্যায় কাজ করেছেন। আমরা ছাড়ব না। তাঁরা পশুকুলের অধিপতিকে ডেকে বললেন— আমাদের ভগিনীর সঙ্গে, নিজের মেয়ের সঙ্গে প্রজাপিতা এই আচরণ করছেন। তুমি বাণ দিয়ে মারো এঁকে। এবার পশুপতি রুদ্র এলেন, বাণে বিদ্ধ করলেন প্রজাপতিকে— তং রুদ্রো'ভ্যায়ত্য বিব্যাধ। প্রজাপতির কী হল না হল, সেটা পরের কথা, কিন্তু এই যে এক দেবতা, প্রথম বিশেষণেই যিনি পশুদের দেবতা—যো'য়ং দেবঃ পশূনাম্— যাঁকে বৈদিক দেবতারা আপন পিতাকেই শাস্তি দেবার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনি যে প্রথম থেকেই চিহ্নিত বৈদিক পরিমণ্ডলের কোনও দেবতা নন, সেটা বোঝা যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতির এই কল্পিত কন্যা মিলনের কাহিনি শতপথ থেকে সামান্য একটু অন্যরকম। সেখানে দেবতারা প্রজাপতির কাণ্ড দেখে বলেছিলেন—যা কেউ কোনওদিন করেনি সেই কাজ করছেন প্রজাপতি। তাঁরা এবার সেই তেমন একজন সাংঘাতিক মানুষটিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন যিনি তাঁদের দুর্বিনীত পিতাকে শাস্তি দিতে পারেন। তেমন কাউকে নিজেদের মধ্যে খুঁজে না পেয়ে দেবতারা নিজেদের শরীরের মধ্যে যে ঘোরতম অত্যুগ্র অংশ ছিল, সেই অংশগুলিকে একত্র করলেন— তেষাং যা এব ঘোরতমাস্তন্ব আসন্ তা একধা সমভরম্। সেই একত্রিত ঘোরতম অংশগুলি দিয়ে যে দেবতার সৃষ্টি হল, তার নাম হল ভূতবান্। এই উগ্ররূপ ভূতবানকে দেখামাত্রই দেবতারা আবার তাঁর কাছে পূর্বের মতো নালিশ জানালেন নিজ পিতা প্রজাপতির বিরুদ্ধে। দেবতারা বললেন—তুমি বিদ্ধ করো একে, মারো একে। ভূতবান্ বললেন— ঠিক আছে, শুনব তোমাদের কথা, কিন্তু আমাকে বর দিতে হবে। দেবতারা বর দিতে স্বীকৃত হলে ভূতবান বললেন— দুনিয়ার যত পশু আছে, তাদের ওপর আমি আধিপত্য চাই। দেবতারা সেই আধিপত্য দিলেন ভূতবান্‌কে, তিনি এবার পশুমান্ হলেন। তিনি তারপর বিদ্ধ করলেন প্রজাপতিকে।

এই ঘটনার পর দেবতাদের ক্রোধ শান্ত হলে সুচিকিৎসায় আবার বেঁচে উঠেছিলেন প্রজাপতি। কিন্তু সে খবর আমাদের কাছে বড় নয়। তার থেকে অনেক বড় খবর হল—দেবতাদের ঘোরতম অত্যুগ্র অংশ নিয়ে ভূতবান্-এর সৃষ্টি, যাঁকে এই ঐতরেয়-স্মৃতি থেকেই পরে আমরা ভূতেশ্বর মহাদেব বলব, আর পশুমান্-এর জায়গায় পশুপতি বলব—পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশম্। আমার কাছে পরম কৌতূহলের বিষয় হল এই বিবর্তন। রুদ্রশিব ভূতবান্-ভূতেশ্বর থেকে পশুমান পশুপতি হলেন। ঐতরেয়তেই দেখছি তিনি ঘোষণা করছেন— দুনিয়ার সমস্ত পশু আমার, আর এই প্রদেশে যা কিছু বর্জ্য বস্তু রইল তাও আমার—মম বা ইদং মম বৈ বাস্তুহমিতি।

আসলে প্রজাপতি কখনও মৃত্যুবরণ করেন না, কেননা তিনি স্বয়ং যজ্ঞ। প্রজাপতি মৃগরূপ ধারণ করে মৃগীরূপী উষার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন বলে রুদ্র শিবের দ্বারা বিদ্ধ হলেন। তাঁর অন্য নাম তাই মৃগব্যাধ। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ দুই জায়গা থেকেই এই ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বিপন্ন অবস্থায় যখন দেবতারা তাঁর শরণ গ্রহণ করছেন, তখনই রুদ্র তাঁর অংশ দাবি করছেন। যজ্ঞেও পশু ব্যবহার করা হয়, সেই পশুর জায়গাটা দেবতাদের অজানা, অথচ পশুযাগ, সোমযাগের জন্য পশু চাই, সেই পশুর আধিপত্য রুদ্র-শিবের। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রুদ্রকে ভূতবান্, পশুমান্ অনেক কিছু নাম দিল, কিন্তু তাকে রুদ্র বলে সম্বোধন করল না। আর দেবতারা তাঁর ইচ্ছেমতো যখন সেই পশুর আধিপত্য এবং যজ্ঞশেষের বর্জ্যাংশের অধিকার দিচ্ছেন, তখন বৈদিক মন্ত্র পড়ছেন রুদ্রের উদ্দেশে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণগ্রন্থ নির্দেশ দিচ্ছে— যজ্ঞের হোতা মন্ত্র পড়ার যেন বেদোক্ত শব্দটিকে 'রুদ্র' না বলে যেন 'রুদ্রিয়' বলেন, কেননা সোজাসুজি নিজের নাম শুনলেও তিনি রেগে যেতে পারেন।

সত্যি বলতে কী, রুদ্রের এই ক্রোধের কারণ দেবতারাই ঘটিয়েছেন বারবার। শতপথ-ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি— যাজ্ঞিক পুরোহিতদের দেওয়া যজ্ঞভাগ লাভ করে দেবতারা স্বর্গে উঠছিলেন, অথবা পৌঁছেই গেছেন স্বর্গে, কিন্তু সেই যে দেবতা, যিনি পশুকুলের অধিপতি, তাঁকে তাঁরা যজ্ঞস্থলেই ফেলে রেখে চলে গেলেন। যজ্ঞের বাস্তুভূমিতে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার ফলে পশুপতি দেবতার নামই হয়ে গেল 'বাস্তব্য'। পশুপতি নিজের এই হেয় অবস্থা দেখে স্বর্গের উদ্দেশে চলে যাওয়া দেবতাদের দেখে ভাবলেন—আরে এরা তো আমাকে এখানেই ফেলে রেখে গেল—অহাস্য হান্তর্যন্তি উ মা যজ্ঞাদিতি। তিনি আয়ত ধনুক উত্তোলন করে যেই না উত্তরের দিকে গেলেন, অমনিই দেবতারা বললেন—বাণ ছেড়ো না যেন। পশুপতি বললেন, তোমরা আমাকে যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করেছ, আর এখন এই কথা। ভালো চাও তো আমার জন্যও বিশেষ একটা যজ্ঞভাগের ব্যবস্থা করতে হবে—আহুতিং মে কল্পয়ত ইতি। দেবতারা সভয়ে বললেন—করছি, করছি, তুমি আপাতত ধনুক নামাও। শিব বুঝলেন—দেবতারা এবার ভয় পেয়েছেন।

দেবতারা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করলেন, ভাবতে চেষ্টা করলেন কী করা যায় শেষ পর্যন্ত। দেবতারা বললেন— যজ্ঞভাগের যত আহুতি সব তো আমরাই নিয়ে নিয়েছি, এখন একটা কিছু তো করতেই হবে। এবার তাঁরা যজুর্বেদের পুরোহিত অধ্বর্যুকে বললেন—যজ্ঞে আহুতি প্রস্তুত করার জন্য যে যজ্ঞস্থালীগুলি আছে, সেগুলির ওপর পর পর ঘি-মাখনের ছিটে

boierpathshala.blogspot.com

দাও ভালো করে, তারপর সবগুলি পাত্রে যা একটু-আধটু পড়ে আছে, সেগুলিকে এক জায়গায় করে একটা অতিরিক্ত আহুতি প্রস্তুত করে নাও, তারপর আহুতি দাও এই পশুমান্ দেবতার উদ্দেশে। অধ্বর্যু তাই করলেন। তখন স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দেবার কাল ছিল। বস্তুত প্রধান যাগের পর, অবশিষ্ট আহুতি দ্রব্য একত্রে নিয়ে অগ্নির উদ্দেশেই পূর্বে এই আহুতি দেওয়া হত। এখন সেই স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে আহুতিটা ভগবান রুদ্রের উদ্দেশেই দেওয়া আরম্ভ হল এবং এই কারণেই রুদ্রকে 'বাস্তব্য' বলা হয়। কেননা 'বাস্তু' মানে যজ্ঞে ব্যবহৃত বস্তুর পড়ে থাকা অবশিষ্ট অংশ। সেই অংশ দিয়েই শেষ পর্যন্ত পশুমান্ রুদ্রের ভাগ কল্পনা করা হল। স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিতে রুদ্রের উদ্দেশে এই আহুতি দেবার ফলে স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিই 'তিনি' বলে চিহ্নিত হলেন। শিবের এই অগ্নিস্বরূপতার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণ বলল—প্রাচ্য দেশের মানুষেরা এই দেবতাকেই বলে 'সর্ব', বাহীক দেশের লোকেরা বলেন ভব, তাঁর সাধারণ নাম পশুপতি, রুদ্র অগ্নি এবং শান্ত।

আমাদের জিজ্ঞাসা হয়, এইবার কি তিনি শান্ত হলেন! দেবতাদের যজ্ঞভাগ পাবার পর কি তিনি শান্ত হলেন। শিবের জন্য দেবতারা কোনও ভাগ রাখেন না, সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচনার যাজ্ঞিক কালেও তাঁকে ভয় দেখিয়েই যজ্ঞভাগ পেতে হয়েছে। এতে একটা কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয় যে, আর্য-ভাবিত দেবতার বৃত্তে রুদ্র-শিব প্রথম দিকে পরিগণিত হননি। পরে যে গণনার মধ্যে এসেছেন, তাও তাঁর ক্রোধের ভয়ে মেনে নেওয়া আর কী। রুদ্র-শিবের যতটুকু পরিচয় বেদ-ব্রাহ্মণে আছে, তাতে এই তথ্য প্রায় প্রমাণাতীত হয়ে ওঠে যে, তিনি যেন সভ্য-জগতের বাইরের মানুষ, সভ্যদের মধ্যে তিনি জোর করে প্রবেশ করেন, তিনি পশুপতি, ব্যাধ, কিরাত পাহাড়ের গায়ে শুয়ে থাকেন তিনি— গিরিশ, সমাজকে, দেবতাকে তিনি শুদ্ধ করেন ধ্বংসের মাধ্যমে। প্রলয়ের আগুন যখন শেষ হয়ে আসে, তখন তিনি শান্ত, শিব।

আসলে শিব হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত তাঁর জীবনটা কেটেছে ভয়ংকর এক 'স্ট্রাগল'-এর মধ্য দিয়ে। সব কিছু 'ভালো' ভাগাভাগি হয়ে গেলে তবে তিনি খবর পান, দুনিয়ার সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ এবং আত্মসাৎ করার পর বর্জ্য বস্তুর অধিকার পাওয়ার জন্যও তাঁকে ধনুক ওঠাতে হয়েছে, দেবতারা তাঁকে স্বীকার করেছেন সমাদরে নয়, ভয়ে। অথচ তাঁকে দরকার হয়েছে সবার। ভাবুন একবার, ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁর অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে যে একটু পুরাকাহিনি শোনানো হল, তাই কিন্তু বৃহত্তর আকারে, দক্ষ-যজ্ঞের বিরাট কাহিনি তৈরি করেছে মহাভারত পুরাণে। মহাভারত-পুরাণের সব তথ্য মিশিয়েই কাহিনিটা জানাই।

দক্ষ ছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলেই তাঁর নাম দক্ষ অর্থাৎ 'একস্‌পার্ট।' তাঁর প্রথম 'একস্‌পার্টাইজ'-টা পৌরাণিকেরা স্বকণ্ঠে উচ্চারণ না করলেও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। ব্রহ্মা লোকসৃষ্টির কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমে কতকগুলি মানস পুত্র তৈরি করলেন। কিন্তু তাঁরা জ্ঞান-বৈরাগ্য তপশ্চর্যা নিয়ে এত বেশি মত্ত হয়ে পড়লেন যে, সন্তান সৃষ্টি, সংসারধর্ম নিয়ে তাঁরা মাথাই ঘামালেন না। দু'দু'বার এইভাবে বিফল হয়ে তিনি দক্ষকে সৃষ্টি করলেন। দক্ষের বিবাহ হল, তাঁর অনেকগুলি স্ত্রী। কিন্তু প্রজাসৃষ্টি বা সন্তান সৃষ্টির সময়ে তিনি পুত্র সন্তান লাভের জন্য এতটুকুও ব্যগ্র হলেন না। তিনি বহুতর কন্যার জন্ম দিলেন। পুরাণ মতে এই কন্যা সন্তানের সংখ্যা কখনও পঞ্চাশ কখনও বা ষাট। তিনি কন্যাদের 'সেট্' ধরে ধরে বিয়ে দিলেন— দশটা মেয়েকে দিলেন ধর্মের হাতে, সাতাশটা দিলেন চন্দ্রকে— এইভাবে পঞ্চাশ থেকে ষাট মেয়ের বিয়ে দিলেন দক্ষ, তার বিস্তারিত হিসেব পেশ করার জায়গাও এটা নয়। কিন্তু ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে যে মেয়েটি জন্মে ছিলেন, সেই সতী-নামের মেয়েটিকে দক্ষ হয়তো শিবের সঙ্গে বিয়ে দিতেন না, কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মা এই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন বলে দাক্ষায়ণী সতীকে তিনি শিবের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হন— দাক্ষায়ণী পুরা দত্তা শঙ্করায় মহাত্মনে।

এদিকে একদিন এইরকম হল যে, বিখ্যাত নৈমিষারণ্যে মুনি-ঋষিদের যজ্ঞ হচ্ছিল, সেখানে হঠাৎই একদিন দক্ষ প্রজাপতি এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখেই ঋষি-মুনি-দেবতারা সকলেই স্তুতি-নতি-প্রণিপাতে উঠে দাঁড়ালেন। সেই যজ্ঞভূমিতে শিবও ছিলেন, কিন্তু দক্ষকে দেখা সত্ত্বেও শিব একবারও উঠেও দাঁড়ালেন না, অভিবাদনও করলেন না। অন্য একটি পুরাণ অনুযায়ী যজ্ঞটা ছিল ব্রহ্মার। সেই যজ্ঞে শিব আর ব্রহ্মা একসঙ্গে বসেছিলেন। মুনি-ঋষি, বিদ্বান, ব্রাহ্মণরা যজ্ঞসভা উজ্জ্বল করে বসেছিলেন। এরই মধ্যে দক্ষ প্রজাপতি উপস্থিত হলেন যজ্ঞস্থলে। মুনি-ঋষিরা সকলে সসম্মানে স্বাভিবাদনে উঠে দাঁড়ালেন দক্ষের উপস্থিতিতে। কিন্তু উঠলেন না ব্রহ্মা, কারণ তিনি দক্ষের পিতা। কিন্তু শিবও বসে রইলেন ব্রহ্মার মতোই। তিনিও উঠে দাঁড়ালেন না।

পৌরাণিক দুটি বিবরণেই দক্ষ-প্রজাপতির প্রতি শিবের একটু অসম্মান প্রকাশ পাচ্ছে এবং তার কারণ হয়তো এই যে, সেই বিবাহের কাল থেকেই দক্ষ তাঁকে পছন্দ করেননি এবং সেই নাপসন্দ ভাবটা তিনি বুঝিয়েও দিতেন শিবকে। এখন সময় বুঝে শিবও সেটা ফিরিয়ে দিচ্ছেন। দক্ষের প্রবেশের সময় তিনি তাঁকে সম্মান জানালেন না। এই অপমান দক্ষ সহ্য করতে পারলেন না। ব্রাহ্মণ-সজ্জন, মুনি-ঋষিরা যখন তাঁর অনুমতি নিয়ে আপন আপন স্থানে বসলেন, তখন দক্ষ প্রথমত একবার দুই-চোখে আগুন ঝরিয়ে তাকালেন শিবের দিকে, তারপর বলতে আরম্ভ করলেন ঋষি-জনতাকে উদ্দেশ্য করে— উবাচ বামং চক্ষুর্ভ্যমভিবীক্ষ্য দহন্নিব। দক্ষ বললেন— এখানে উপস্থিত ব্রহ্মর্ষিরা শুনুন সকলে, শুনুন দেবতারা, শুনুন অগ্নিদেব! এই যে লোকটাকে দেখছেন, এর লজ্জা বলে কোনও বস্তু নেই। আপনাদের সকলের মানমর্যাদা সব নষ্ট করে ছাড়বে এই লোকটা। ভদ্রলোক, সজ্জন যে পথে চলেন, সেই পথটাকেই এ দূষিত করে ছাড়বে— সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থাঃ যেন স্তব্ধেন দূষিতঃ, উপনয়নের সময় একজন ব্রাহ্মণ আচার্যগুরুর কাছে যে-রকম নম্রতায় গায়ত্রী মন্ত্র শেখে, এই লোকটা তো সেই শিষ্যের মতো নম্রতাতেই আমার মেয়ের হাত ধরেছিল বিয়ে করার জন্য। কিন্তু বানরচোখো এই মর্কটলোচন আমার অমন সুন্দরী মেয়েটাকে বিয়ে করল— গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পানিং মর্কটলোচনঃ, কিন্তু তারপর এই পূজনীয় শ্বশুরকে দেখে সামান্য দাঁড়িয়ে ওঠার ভদ্রতাটুকুও দেখাতে পারছে না।

দক্ষ শুধুমাত্র এই ভর্ৎসনাতেই থেমে থাকেননি। প্রথমে তিনি পুরনো কাসুন্দিটুকু তুলে এনেছেন সকলের সামনে। বলেছেন— আমি চাইনি, আমি কখনও চাইনি আমার মেয়েটার সঙ্গে এই অসভ্য ইতর লোকটার বিয়ে হোক। আমাদের যাগ যজ্ঞের, ক্রিয়া কর্মের সদাচার এতটুকুও ওর মধ্যে নেই, নোংরা অশুচি মানুষ, নিয়ম বিধির সমস্ত সেতু ভেঙে দিয়েছে এই লোকটা, অথচ ভিতরে হামবড়াই আছে ষোলো আনা— লুপ্তক্রিয়ায় অশুচয়ে মানিনে ভিন্নমেতবে। লোকটার ব্যবহারের মাথামুণ্ডু নেই কোনও। শ্মশানে-মশানে প্রেতাবাসে থাকে, সব

boierpathshala.blogspot.com

সময় ঘিরে আছে ভূতপ্রেতের দল, পাগলের মতো হাঁটাচলা, কখনও ন্যাংটো হয়ে থাকে, কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, গায়ে চিতাভস্ম-মাখা, গলায় হাড়ের মালা, অথচ এইরকম একটা উন্মাদের গুরুঠাকুরের হাতে আমার সমস্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, আমার লক্ষ্মীমতী মেয়েটাকে তুলে দিতে হল— অনিচ্ছন্নপ্যদাং বালাম্— যেন সামনে শুদ্দুরকে বসিয়ে বেদ পড়াচ্ছি আমি— অনিচ্ছন্নপ্যদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরাম্।

তিরস্কার শেষে দক্ষ বুঝলেন যে, তাঁর জামাইকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে এই সভাতেই, তা নইলে অন্যতর এক যজ্ঞস্থলে সে যদি সবার সামনে আবারও তাঁর সম্মাননীয়তা নষ্ট করে দেয়। দক্ষ অভিশাপ দিয়ে বললেন— ইন্দ্র, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতার মতো এই লোকটা যেন কোথাও ঋষিদের দেওয়া যজ্ঞভাগ না পায়— সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ। শিবের উদ্দেশে কঠিন অভিশাপ উচ্চারণ করে দক্ষ আর সেই যজ্ঞসভায় দাঁড়ালেন না, তিনি সবেগে নিজের ভবনে চলে গেলেন। দক্ষের অভিশাপ শুনে শিবানুচর নন্দী বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনিও অনেক অভিশাপ উচ্চারণ করলেন বৈদিক যাগ-যজ্ঞের ঐতিহ্যবাহী দক্ষকে এবং তাঁর অনুগামীদের। নন্দীর অভিশাপে দক্ষ ছাগমুখ, যজ্ঞের পশুবলিতে ছাগই প্রধান উপকরণ বলে যজ্ঞানুবর্তী দক্ষ ছাগের অনুকৃতি লাভ করলেন। বৈদান্তিক ভাবনায় বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কর্ম অবিদ্যার মধ্যেই পড়ে, দক্ষ সেই কর্মময়ী অবিদ্যাকেই আত্মতত্ত্ববিদ্যা বলে ভেবে নিয়েছেন বলেই তিনি অজ বলেই চিহ্নিত হয়েছেন। নন্দীর শাপের উলটো পক্ষে দাঁড়িয়ে দক্ষের অনুবর্তী ভৃগু আবার শিব-সহচরদের অভিশাপ দিলেন।

এত শাপ-শাপান্তের মধ্যে শিবের আর থাকতে ইচ্ছে হল না। দক্ষের কটূক্তি আর অভিশাপ শুনেও তিনি কোনও প্রত্যুক্তি করেননি, এবং নিজেকে নিয়ে অনুবর্তী এবং প্রত্যনুবর্তী জনের মধ্যে এই বাদানুবাদ শুনে বিরক্ত শিবও বেরিয়ে গেলেন যজ্ঞসভা ছেড়ে। পুরাণ জানিয়েছে যে, বহুকাল ধরে দক্ষ আর শিবের এই শ্বশুর-জামাই ঝগড়াটা চলেছিল। এরপর ব্রাহ্মণ্যের তাড়নায় দক্ষের পদমর্যাদা আরও বাড়ল এবং তিনি এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করলেন কনখল তীর্থে। এই বিরাট যজ্ঞে তিনি সমস্ত বড় বড় দেবতা, ঋষি-মুনি, গন্ধর্ব— সকলকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করলন, কিন্তু শিবকে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন না, এমনকী নিজের মেয়ে দাক্ষায়ণী সতীকেও না। মহাধুমধামে যজ্ঞের সূচনা হয়েছে, দেবতা মুনি-ঋষিরা অনেকে আসছেন এবং অনেকে আসবেন, কিন্তু শিবের কোনও খবর নেই। সভায় উপস্থিত দধীচি মুনি দক্ষকে বললেন— সবাইকেই তো দেখছি, কিন্তু সমস্ত মঙ্গলের আকর শিবকে কেন দেখছি না এখানে। আপনার উচিত— ব্রহ্মা-বিষ্ণু কাউকে পাঠিয়ে দাক্ষায়ণী সতীসহ শিবকে নিমন্ত্রণ করে আনুন এখানে। এমন শিবহীন যজ্ঞ শোভা পায় না— তথাচিৎ যজ্ঞস্তু ন শোভতে ভৃশং/পিনাকিনা তেন মহাত্মনা বিনা।

দধীচি মুনির কথা কানেই নিলেন না দক্ষ। বললেন— যজ্ঞ, দান এবং ধর্মের মূল হলেন বিষ্ণু। তিনি রয়েছেন এখানে, ব্রহ্মা রয়েছেন লোকপিতামহ, আছেন ইন্দ্র-সহ সব দেবতারা। সেখানে এই অগ্নিশুদ্ধ যজ্ঞক্রিয়ার মধ্যে রুদ্র-শিবের আর কোনও প্রয়োজন নেই। দেবতার মধ্যে সে বড় অকুলীন জন। ব্রহ্মার কথায় তার হাতে মেয়ে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সে একেবারে নষ্ট মানুষ, আর নষ্ট লোকেরাই তাঁকে ভালোবাসে— নষ্টো নষ্টজনপ্রিয়ঃ। এ-সব জায়গায় আসার কোনও যোগ্যতাই নেই তার।

এদিকে যজ্ঞস্থলে এইসব চলছে, ওদিকে আর এক চিত্র। গন্ধমাদন পাহাড়ে বসে দাক্ষায়ণী সতী মাঝে-মাঝেই লক্ষ করছেন যে, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণের মতো দেবতারা সালংকারা স্ত্রীদের নিয়ে মাঝে মাঝেই দিব্য বিমানে উঠছেন, আর কোথায় যেন চলে যাচ্ছেন। রোহিণীকে নিয়ে চন্দ্র যখন বিমানে উঠছেন, তখন পরিচারিকা সখীকে দাক্ষায়ণী সতী চন্দ্রের বৈমানিক গন্তব্যস্থলের সবিশেষ জেনে আসতে বললেন। সব জেনে সখী যখন জানাল যে, দক্ষ যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন, তখন মিলে গেল তাঁর মানসিক জল্পনার কথা। তাঁরও কানে আসছিল, আর গায়েও একটু জ্বালা হচ্ছিল— চোখের সামনে যক্ষ-গন্ধর্বদের মতো উপদেবের বউরাও কীরকম জাঁক করে সেজে স্বামীর হাত ধরে বিমানে উঠছে— বিমান-যানাঃ সপ্রেষ্ঠা নিষ্ককণ্ঠীঃ সুবাসসঃ। দেবী দাক্ষায়ণীর মনে বড় ঔৎসুক্য হল, তাঁরই বাপের বাড়িতে দেবতারা সব ছুটছেন, আর বাড়ির মেয়ে হয়ে তিনি বসে আছেন এইখানে! তিনি রুদ্র-শিবের কাছে গেলেন।

না, কোনও ভয়ংকর অভিযোগ জানিয়ে কথা বললেন না দাক্ষায়ণী, বরঞ্চ তাঁর ঔৎসুক্য অনেক বেশি বাপের বাড়ি নিয়ে। এত বড় একটা যজ্ঞ হচ্ছে, অথচ তিনি নেই, কতই অসুবিধে হচ্ছে পিতা দক্ষের। দাক্ষায়ণী রুদ্র শিবকে বললেন— হ্যাঁগো শুনেছ কথা? তোমার শ্বশুর নাকি বিরাট যজ্ঞ করছেন— প্রজাপতেস্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রতং/ নির্যাপিতো যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল। যজ্ঞ তো নয় মহোৎসব! সব দেবতারা সেখানে যাচ্ছে। তুমি যাবে না? আমার যত বোন আছে, সবাই যাচ্ছে স্বামীদের সঙ্গে, আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গে দেখা হবে। যজ্ঞবাড়িতে আমার বোনেদের কত গয়নাগাঁটি দেবেন আমার বাবা, আমরাও তো সে-সব কিছু পাব। তাছাড়া কতকাল আমার বোনেদের সঙ্গে দেখা হয় না, মা-মাসিদেরও দেখিনি কতকাল। আর তুমি এ-সব বুঝবে না, তুমি তো আর বাপের বাড়ি ছাড়ার কষ্ট পাওনি। আমি তাঁর মেয়ে হয়ে কী করে এখানে বসে থাকি বলো? না হয় ঠাট ঘটা করে নেমন্তন্ন করেনি তোমাকে, তাতে কী? বন্ধুর বাড়ি, স্বামীর বাড়ি, গুরুর বাড়ি আর বাপের বাড়ি— এখানে কেউ না ডাকলেও যাওয়া যায়— অনাহূতা অপ্যযন্তি সৌহৃদং/ভর্তুগুরো র্দেহকৃতশ্চ কেতনম্।

সব শুনে রুদ্র-শিব বললেন— ঠিক কথা, এসব জায়গায় না ডাকলেও যাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে তোমার আত্মীয় বোন-ভগ্নীপতিদের এবং আত্মাভিমানী মানুষগুলির গুমোর সইতে পারবে তো? তুমি যে এত 'আত্মীয়-আত্মীয়' বলে গরিমা করছ, আত্মীয়দের তো তুমি চেনো। এক-এক জন যা কথা বলে, তার থেকে বাণের খোঁচাও কম লাগে। সবসময় তাঁদের বাঁকা বুদ্ধি, বাঁকা কথা, এমন কথা বলবে সারা দিন-রাত জ্বলে-পুড়ে মরবে শেষে— স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভিঃ/ দিবানিশং তপ্যতি মর্মতাড়িতঃ। তাছাড়া তোমার বাবা! প্রজাপতি দক্ষ! নিজের জায়গায় তিনি কত মর্যাদাশালী মানুষ। সমস্ত মেয়েদের মধ্যে তোমাকে তিনি ভালোবাসেন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আমার জন্যই তুমি সেখানে অসম্মানিত হবে। আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়েছে, এটাই তো তিনি সহ্য করতে পারেন না। তুমি তো খুব ভালোই জানো যে, ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলে তোমার বাবা আমাকে কী অপমানই না করেছিলেন, অথচ সেখানে আমার কোনও দোষই ছিল না। এখন তুমি যদি আমার বারণ না শুনে সেখানে যাও, সেখানে তোমার যে অপমান হবে, সে অপমান তুমি সইতে পারবে না।

পুরাণ বলেছে— দাক্ষায়ণী সতী রুদ্র-শিবের কথা সেভাবে মেনে নিতে পারলেন না। আর বাপের বাড়িতে পুরানো

boierpathshala.blogspot.com

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হবে— এই আবেগটুকু তাঁর মধ্যে এত গভীর হয়ে উঠল যে, তিনি স্বামীর ওপরে বেশ একটু রেগেই গেলেন, ওদিকে রুদ্র-শিবের যুক্তিটাও তিনি ফেলতে পারছেন না— পিতা তাঁকে নিমন্ত্রণ করেননি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর কাছে বাপের বাড়ি যাবার উদগ্র ইচ্ছেটাই বড় হয়ে উঠল। তিনি একাই ঘর ছেড়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। পিতৃগৃহে প্রবেশ করতেই দক্ষযজ্ঞের বিশাল আড়ম্বর চোখে পড়ল, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত আবেগের জায়গাটা মোটেই সুখের হল না। রুদ্র-শিবের ব্যাপারে দক্ষের মনোভাব জানেন বলেই পিতৃভবনের অন্যান্য জনেরা তাঁকে খুব একটা সাদর আপ্যায়ন করল না। শুধু তাঁর মা এবং বোনেরা তাঁকে সানন্দ আলিঙ্গন করলেন। কিন্তু পিতা দক্ষ মেয়েকে উপস্থিত দেখেও একেবারে উদাসীন রইলেন এবং এতটুকুও তিনি সরলেন না দেখে দাক্ষায়ণী সতী তাঁর বোনেদের কুশল-প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না, মা-মাসিদের দেওয়া আশীর্বাদ জিনিস-পত্রও নিতে পারলেন না, এমনকী বসার আসনেও বসতে পারলেন না ভালো করে— দত্তাং সপর্যাং বরমাসনঞ্চ সা/নাদত্ত পিত্রা প্রতিনন্দিতা সতী।

দাক্ষায়ণী সতীর চরম অপমান হল। তিনি এবার পিতার বিরুদ্ধে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। সতী প্রথমত শিবের অনেক প্রশংসা করলেন এবং তিনি যে কামপূরক বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অনেক ঊর্ধ্বে, সেটা বোঝাতে গিয়ে পিতা দক্ষকে তিনি প্রচুর নিন্দা করলেন। বিশেষত শিবের জন্য কোনও যজ্ঞভাগ না থাকায় দক্ষকে তিনি সংকীর্ণমনা বলে বিস্তর তিরস্কার করলেন। পরিশেষে খুব সুন্দর করে বললেন যে, আমার স্বামী শংকর যখন পরিহাস করেও আমাকে যদি ক্বচিৎ কখনও দাক্ষায়ণী বলে ডাকেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে হাসি চলে যায়, আমার দুঃখ হয় এই ভেবে কেন তোমার নাম এইভাবে জুড়ে আছে আমার পরিচয়ের মধ্যে, আমার এই শরীরের মধ্যে। তোমার অঙ্গ থেকে উৎপন্ন এই মৃতদেহের তুল্য শরীরটাই আমি আর রাখব না, আমি মরব ব্যপেত-নর্মস্মিতমাশু তদ্ধ্যহং/ব্যুৎস্রজ্য এতৎ কুণপং ত্বদঙ্গজম্। সতী এই কথা বলে যজ্ঞবেদির কাছে উত্তরাভিমুখে বসে পড়লেন মৌনী হয়ে, নয়ন মুদ্রিত করে তিনি যোগ অবলম্বন করলেন আত্মবলি দেবার জন্য। দাক্ষায়ণী সতীর যোগ-সমাধি এমন এক চূড়ান্ত একনিষ্ঠার মধ্যে পৌঁছল যে, তাঁর সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠল। সতী দেহত্যাগ করলেন। এইরকম একটা ভয়ংকর বিপর্যয় দেখে সতীর সঙ্গে যেসব অনুচরেরা এসেছিল তাঁকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে, তারা অস্ত্রশস্ত্র উঁচিয়ে ধেয়ে এল দক্ষকে মারার জন্য— দক্ষং তৎপার্ষদো হন্তুমুদতিষ্ঠন্নুদায়ুধাঃ। শিবানুচরদের এই অতিক্রম দেখে দক্ষ যজ্ঞের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক ভৃগু নাকি মন্ত্র পড়ে এমন একখানা আহুতি দিলেন যাতে ঋভুদের মতো উপদেবতারা যজ্ঞের বেদির মধ্য থেকে উঠে এসে স্তব্ধ করে দিল শিবানুচর প্রমথদের।

যৎসামান্যে বলা রাখা ভালো, যে, দক্ষের পক্ষপাতী ভৃগু তথা ভার্গব ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই বৈদিক পরম্পরা, এবং যাগযজ্ঞের প্রাধান্য-ভাবনা প্রকট করে তোলে, ঋভুগণের দেবতারাও এক বৈদিক প্রযুক্তি যা পৌরাণিক কথকতার মধ্যে এসে পড়েছে সাধারণের পরমপ্রিয় দেবতার বিরুদ্ধে। শিবানুচরেরা সাময়িকভাবে স্তব্ধ হলেন বটে, কিন্তু এবার খবর গেল শিবের কাছে। নারদ গিয়ে জানালেন সব কথা। সব শুনে রুদ্র শিব ক্রোধে উত্তাল হয়ে উঠলেন এবং তাঁর বিশাল জটাপুঞ্জ থেকে বহ্নিশিখার মতো একগাছি জটা উপড়ে নিয়ে ফেললেন মাটিতে। সেই জটা থেকে জন্ম নিলেন বীরভদ্র— শিবের সেনাপতি। শিবের ক্রোধ থেকেই তাঁর জন্ম। খেয়াল করুন, ভার্গব ব্রাহ্মণদের ক্রুদ্ধ ঘৃতাহুতির প্রতিপক্ষে 'প্রিমিটিভ' জটার ব্যবহার, বৈদিক ঋভুগণের প্রতিপক্ষে 'কপালী ত্রিনেত্র' বীরভদ্রের সৃষ্টি গবেষকের অন্তরঙ্গ আলোচনার জায়গা। কিন্তু আপাতত বুঝুন, বীরভদ্র বস্তুত রুদ্র শিবই।

যাইহোক, বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞের থানে এলেন অন্যান্য শিবানুচর-বাহিনী নিয়ে। দক্ষযজ্ঞ কীভাবে এবং কত খারাপভাবে পণ্ড করে দেওয়া হয়েছিল, বিভিন্ন পুরাণে তার বিভিন্ন বর্ণনা আছে। বস্তুত সেগুলি এখানে বর্ণনা করতে পারলে আমারও বেশ আনন্দ এবং মজা হত। আমরা সেটার মধ্যে না গিয়ে গবেষণার চমৎকারে দুটো কথা বলি। পৌরাণিক ভাবনায় আমার কাছে প্রথমত যেটা সবচেয়ে 'ইনট্রিগিং' এবং মধুর লাগে, সেটা হল— যেই না বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করার মনোবৃত্তিতে তাঁর ভয়ংকর উদগ্র রূপ প্রকট করে তুললেন, ববম্-ববম্ করে গাল বাজিয়ে তাঁর সঙ্গে এগিয়ে চলল শিবসেনাবাহিনী, তখন একটি পুরাণ বলল— দক্ষের স্ত্রী প্রসূতি এবং অন্যান্য দক্ষ-স্ত্রীরা তাঁদের মেয়েদের সামনেই আলোচনা করতে লাগলেন যে, দক্ষ সমস্ত মেয়েদের সামনে নিরপরাধ মেয়েটাকে যেভাবে অবজ্ঞা করেছেন, যেভাবে সতীকে স্বামী নিয়ে অপমান করেছেন তিনি, তারই ফল ফলবে বলে মনে হচ্ছে।

দক্ষের আপন ঘরের বউ-ঝিরা এইভাবে যে স্বামীর দোষদর্শন করতে পারছেন এবং রুদ্র-শিবের প্রতি তাঁর অনাদর-ঘটনাটাকে নিন্দা করতে পারছেন, এইটাকে আমরা শিব-জাগরণের একটা দিক বলে মনে করি। সতী তাঁর ব্রাহ্ম-প্রতিভূ পিতার বিরুদ্ধে কথা বলছেন, মেয়ের মায়েরা মেয়ের জন্য স্বামীকে দুষছেন, এই ক্ষমতায়নটা শিবের জন্যই সম্ভব হচ্ছে। এই যজ্ঞধ্বংসের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল— বেছে বেছে যজ্ঞস্থলের সেইসব যজ্ঞপাত্র অপবিত্র করা, যজ্ঞস্থানের সেইসব প্রয়োজনীয় তৈরি করা কাঠামোগুলি ভেঙে দেওয়া যা যজ্ঞ শেষ হওয়া পর্যন্ত কাজে লাগবে। বীরভদ্র এবং শিবানুচরেরা যজ্ঞস্থলের মধ্যে এই অপবিত্রতা তৈরি করে বুঝিয়ে দিতে চাইল যে, আর্যায়ণী বৃত্তিতে যেসব যজ্ঞ বস্তুর সামান্য নড়চড় অথবা সামান্য অন্যথা করাটাকেই চরম অন্যায় এবং শুভহানির ঘটনা বলে ভাবা হত, সেগুলিকে তছনছ করে দেওয়া সত্ত্বেও শিবানুচরদের গলা দিয়ে রক্তও উঠল না, কিংবা তাদের মাথায় বজ্রপাতও হল না। মণিমান নামে এক যক্ষ দক্ষযজ্ঞের অধ্বর্যু ঋত্বিক ভৃগুমণিকে বেঁধে রাখলেন, বীরভদ্র বাঁধলেন স্বয়ং দক্ষকে, চণ্ডেশ্বর বাঁধলেন সূর্যরূপী পূষাকে আর নন্দী বেঁধে রাখলেন ভগ-দেবতাকে।

শুধুমাত্র বন্ধনেই শেষ হল না সেই সব রৌদ্র ক্রিয়াকলাপ। যজ্ঞভূমির সার্বিক ধ্বংসের পর দক্ষকে নিয়ে পড়লেন বীরভদ্র। এর আগে যখন যজ্ঞ চলছিল, ভৃগুমুনি হোমপাত্র হাতে নিয়ে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেন, তখনই বীরভদ্র তাঁর দাড়ি উপড়ে নিয়েছিলেন, কেননা এই ভৃগু সেই ব্রহ্মসভায় শিবকে দেখে দাড়ি-গোঁফ নাচিয়ে হেসেছিলেন— ভৃগো-র্লুলুষ্ণে সদসি যো'হসৎ শ্মশ্রু প্রদর্শয়ন্। দক্ষ যখন সেই সভায় শিবনিন্দা করেছিলেন, তখন এই ভগ-দেবতা বারবার চোখের ইঙ্গিতে দক্ষকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, বীরভদ্র তাই ভগদেবতার চোখ-দুটি উপড়ে নিলেন। আমরা মহাভারত-পুরাণে বারবার শিবের 'এপিথেট' হিসেবে এই শব্দটা পাব— শিব ভগ দেবতার নেত্র হরণ করেছিলেন— ভগনেত্রহরং হরম্। পূষা-সূর্য সেই সভাস্থলে শিবনিন্দার সময় দাঁত দেখিয়ে হেসেছিলেন বলে

boierpathshala.blogspot.com

বীরভদ্র তাঁর দাঁতকপাটি উপড়ে নিলেন। আর সর্বশেষ দক্ষের অবস্থা হল গুরুতর। বীরভদ্র তাঁকে নানা অস্ত্র-প্রহরণে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারছিলেন না; অবশেষে অদ্ভুত এক প্রতীকী অবসান ঘটল দক্ষের। মনে থাকবে আপনাদের— সেই ব্রহ্মসভায় নন্দীর অভিশাপে দক্ষ ছাগমুণ্ড হয়েছিলেন। ছাগ একেবারেই বলির পশু, যজ্ঞীয় পশু হিসেবে পরিচিত। যজ্ঞকালে পশুবধের সময় তাকে আগে শ্বাসরোধ করে মারতে হয়, তারপর তার গলা কেটে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করতে হয়। বীরভদ্র তাই প্রথমে দক্ষের গলা টিপে ধরে শ্বাস রোধ করলেন, তারপর যেভাবে ছাগমুণ্ড কেটে বিচ্ছিন্ন করে, সেইভাবে দক্ষের ছাগমুণ্ড বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন বীরভদ্র।

এইভাবে দক্ষ-প্রজাপতি যজ্ঞীয় পশুর প্রতীকে বধ করার মধ্যেই বৈদিক যজ্ঞভাবনার প্রত্যাখ্যান যেমন সূচিত হয়, তেমনই সমস্ত যজ্ঞস্থলকে তছনছ করে ফেলার মানেও যজ্ঞভাবনার প্রতিপক্ষ ভূমিতে রুদ্র শিবের উত্থান সূচনা করা। আবার এই কাহিনির মধ্যে শিবকে দেবোচিত যজ্ঞভাগ না দেবার মধ্যে যে বঞ্চনা যন্ত্রণা তৈরি করা হয়েছে এবং অবশেষে ভয়ে তাঁকে স্বীকার করে নেওয়া— এই বৈশিষ্ট্যগুলিই একদিকে যেমন এক মানতে-না-চাওয়া দেবতাকে পরম মাননীয় করে তুলেছে, তেমনই সেটা ধ্বংসকারী রুদ্র থেকে শান্ত, শিব, সুন্দর করে তুলেছে। কেননা মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাগ পড়ে যায়, তখন তিনি পরমোদার, মহান, দাতা। তবে কিনা তাঁর সরল স্বভাবের সুযোগ নেওয়াটা আর্যেতর জনগোষ্ঠীর পরম এবং চরম প্রতিভূকে মূর্খ, বোকা ভাবার গরিমা, নাকি সেটা ব্রাহ্মণ্য পুষ্ট আর্য মহাত্মাদের অগৌরবের বার্তা বহন করে, সেটা ভেবে দেখার মতো বিষয়।

এই ঘটনা-বিশ্লেষণের তালে আমার সমুদ্র-মন্থনের কাহিনি মনে পড়ে। সমুদ্রমন্থনের তাড়না তৈরি হয়েছিল দেবতা এবং অসুর দুই পক্ষ থেকেই— প্রধান প্রয়োজন ছিল ঐশ্বর্য এবং আরোগ্য— লক্ষ্মী এবং অমৃত-পুরাণ বলেছে— অমৃতার্থে চ লক্ষ্ম্যর্থে মহান্তং বৈরমাশ্রিতাঃ। দেবতা এবং অসুরেরা দুই পক্ষই নিজেদের ভাগ নিয়ে পরস্পর বিবাদ করতেন সব সময়। সে বিবাদ চরমে উঠলে ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হয়। তিনি আশ্বাস দেন সমুদ্রমন্থন হলে আমরা অমৃত লাভ করব, তাতে জরা-মৃত্যু দূরে যাবে, আর বেঁচে থাকার জন্য ঐশ্বর্যও পাব অনেক। তোমরা সকলে মিলে সমুদ্র-মন্থন করো— মথ্যতাং কলশোদধিঃ, দেখুন, এই বিরাট আয়োজনে দেবতারা সবাই আছেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু সবাই আছেন, কিন্তু শিবকে জানানোই হল না। আর তিনিও সেইরকম! জানতেও পারলেন না কিছু। এত কাণ্ড ঘটে গেল, কোথা থেকে মন্দর পর্বতকে উপড়ে তুলে এনে ফেলা হল সমুদ্রের মধ্যে, মন্থনদণ্ড হিসেবে সেই মন্দর পর্বতকে স্থির রাখার জন্য তার তলায় কূর্মপৃষ্ঠ পেতে দিলেন স্বয়ং বিষ্ণু, মন্থন রজ্জু হয়ে নিজেকে মন্দরের চারপাশে পেঁচিয়ে নিলেন নাগরাজ বাসুকি। এত সব বড় বড় কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু ভোলানাথ শংকর খবর পেলেন না, খবর রাখবার যে খুব ইচ্ছেও আছে তাঁর, তাও নয়। কৈলাস পর্বতের এক টেরে তিনি কী যে যোগসিদ্ধির সমাধিতে বসে থাকেন, তা কারও বোধগম্য নয়।

সমুদ্রমন্থন থেকে কত কিছু মহার্ঘ সামগ্রী উঠে এল— হাতি, ঘোড়া, চাঁদ, কৌস্তুভমণি, সুরা আরও কত কিছু, এমনকী অমৃত নিয়েও উঠলেন স্বয়ং ধন্বন্তরী। মহাভারতে দেখা যাচ্ছে— সমস্ত ভালো জিনিস সমুদ্র থেকে উঠে আসার পর সবার শেষে উঠল অমৃত এবং তারও শেষে উঠল বিষ। বাসুকি নাগকে অতিরিক্ত টানাটানি করার ফলেই নাকি এই ভয়ংকর বিপত্তি। ওদিকে অমৃত উঠেছে, সকলে 'অমৃত আমার, আমারই অমৃত'— এইরকম করে চেঁচামেচি করছে, এরই মধ্যে বিষের ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে গেল। বিষের গন্ধেই সকলে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় শংকর ভগবানের কাছে আর্জি গেল। তিনি বিপদ ত্রাণে এগিয়ে এলেন, সমস্ত বিষ পান করে ধারণ করলেন আপন কণ্ঠে— দধার ভগবান কণ্ঠে মন্ত্রমূর্তির্মহেশ্বরঃ। সেই থেকে নীলকণ্ঠ হলেন শিব।

মূল মহাভারতে এই বিষভক্ষণের ব্যাপারটা যতই পরিশীলিত উপায়ে বর্ণিত হোক, মহাভারত যেখানে লোকায়ত হয়ে মানুষের কাছাকাছি এসেছে, সেখানে কিন্তু শিবকে পুনরায় বঞ্চনার শিকার হিসাবেই দেখেছেন পৌরাণিকেরা। কাশীরাম দাসে দেখা যাচ্ছে—সুরাসুর, যক্ষ, রাক্ষস সবাই জানে সমুদ্রমন্থনের কথা, কিন্তু শিব জানেন না। নারদ কৈলাসে এসে শিবকে গোপন খবর দিলেন পার্বতীর সামনে। সেই খবর দেবার মধ্যে ঈর্ষা ধরানোর উপাদান ছিল। নারদ বললেন— শুনলাম, সমুদ্রমন্থন করে বিষ্ণু পেলেন লক্ষ্মীকে, পেলেন কৌস্তুভ মণিও। ইন্দ্র নিয়ে গেল উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া, ঐরাবত হাতি, আরও কত দেবতা কত কী নিয়ে গেল, শুধু তোমাকে কেউ কিছু দিল না—তোমারে না দিয়া ভাগ সবে বাঁটি নিল। শিব এসব কথার কোনও উত্তর দিলেন না, তিনি এই সব লাভকে গণ্যও করেন না। কিন্তু শিবজায়া দেবতাদের এই স্বার্থভাব মোটেই সহ্য করতে পারলেন না। তিনি নারদকে বললেন— কাকে বলছ এসব কথা। একটা গাছের মতো স্থাণু পুরুষের কানে কি আর এসব ঢোকে? আর কৌস্তুভ মণি-টনি দিয়ে এ লোকটা কী করবে কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার। আর ইন্দ্রের হাতি ঘোড়া দিয়েই বা এই মানুষটা কী করবে, ওর তো বলদ আছে। আবার অমৃতের ভাগ নিয়ে ইনি কী করবেন—অমৃতে কি কাজ যার ভক্ষ্য সিদ্ধিগুলি।

পার্বতীর অনন্ত অভিমানী কথা শুনলেন শিব এবং উত্তর দিলেন এমন এক দার্শনিক উন্নাসিকতায় যা কাশীরামই তৈরি করতে পারেন শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করে। শিব বলেছেন—এই সব বাহন ভূষণ নিয়ে আমি করবটা কী—আমি লই তাহা যাহা ত্যজে অন্য জন। ভেবে দেখুন, সকলের বর্জিত বস্তু শিবের ভাগে আসার ব্যাপারটা কিন্তু সেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণের কাল থেকে একটা ট্রেইট। কিন্তু সেখানে রুদ্র শিবকে ভয় দেখিয়ে ভাগ আদায় করতে হয়েছিল, কিন্তু কালের গতিকে এবং মানুষের নিরন্তর প্রার্থনায়—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং/তেন মাং পাহি নিত্যম্—রুদ্র শিব এখন শান্ত সুন্দর। শিব তাঁর প্রত্যেকটি আভরণে অন্য দেবতার বর্জ্যতার যুক্তি দিয়েছেন। পরিধানে সকল দেবতার দিব্য বাস, তিনি বাঘছাল বেছে নিয়েছেন। বিষ্ণু কৃষ্ণের কস্তুরী কুঙ্কুমের বিলেপন গায়ে-কপালে, শিবের গায়ে, ছাই। অন্য দেবতারা 'রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ। কেহ নাহি লয় তাই আছয়ে বলদ।'

এই বিরাগ-বৃত্তির কথা শুনে শিবজায়ার হৃদয় বিগলিত হল না। তিনি মধ্যযুগের বাঙালি বউয়ের মতো মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন,—ছেলেমেয়ে নিয়ে যাকে সংসার চালাতে হয়, তার এই দারিদ্র- বিলাস কোথা থেকে আসে? এই উতোর-চাপানে দেবীর মুখে কাপুরুষ শব্দটি শুনে শেষ পর্যন্ত ভীষণই রেগে যান শিব এবং অবশেষে তিনি সমুদ্রমন্থনের অকুস্থলে যাত্রা করেন—ক্ষণেকে ক্ষীরোদকূলে/ উত্তরিলা দলবলে/ যথা সিন্ধু মথে সুরাসুর। শিবকে দেখে সবাই তটস্থ হলেন, কিন্তু সেই ভয়ের মধ্যেও দেবরাজ ইন্দ্র আবার পাকামি করে বললেন— সমুদ্রমন্থন তো শেষ হয়ে গেল, স্বয়ং বিষ্ণু আমাদের বলে দিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

গেছেন—আর মন্থন হবে না। এ কথায় রুদ্র-শিবের প্রচণ্ড রাগ হল। বললেন—এত বড় কথা! সমুদ্রমন্থন করে ভালো ভালো জিনিস নিজেরা বেঁটেবুঁটে নিলে, তখন 'কেহ না করিলে চিত্তে আছেন ধূর্জটি।' আর এখন মন্থন করতে বলছি, আর তোমরা বিষ্ণুর কথা শোনাচ্ছ? আমি বলছি—আবারও মন্থন আরম্ভ করতে হবে। মুনি-ঋষিরা শিবকে অনেক বোঝালেন, বারংবার ব্যবহৃত হয়ে বাসুকি নাগের হাড়মাংস চুরচুর হয়ে গেছে। জলনিধি সাগরের এই উত্তাল আলোড়নও আর সইতে পারছেন না বরুণদেব। অনেক বোঝাতে শিবের মায়াও হল। এদিকে এত রাগ দেখিয়ে ফেলেছেন, সেটা মুহূর্তে গিলে ফেললে কথাবার্তার কোনও মূল্য থাকে না বলেই তিনি অনুরোধ করে বললেন—আমা হেতু মথ একবার। আগমন অকারণ না হোক আমার।

কাশীরাম কিন্তু অসম্ভব ভালো একটা 'লিংক' তৈরি করেছেন। মহাভারতে ধন্বন্তরি অমৃতের কলস নিয়ে উঠলেন, তারপরে আর বিষ ওঠার তর্কযুক্তি থাকে না। সেখানে হঠাৎই এই তথ্য নিবেদন যে, বিষ উঠল বাসুকির ফণায়, তাতে পৃথিবীর সকলে যখন মূর্ছিত হবার জোগাড়, তখন শিব এসে বিষ পান করলেন আর নীলকণ্ঠ হলেন তাতে। কিন্তু কাশীরামের এই যুক্তিটা 'মিথে'র একটা যোগসূত্র তৈরি করে দেয়, দুটি পৃথক ঘটনার একসূত্রী সদর্থকতা তৈরি করে। শিব এখানে প্রথমে ক্রুদ্ধ হলেন, তারপর সকলের দুঃখ দেখে মায়ায় পড়েন, অবশেষে অভিমানিনী পত্নীর কাছে সম্মান রক্ষা করার জন্য কোনও মতে আর একবার মন্থন চালাতে বলেন, ফল একই হল—বিষ উঠল সমুদ্রমন্থনে। সেই বিষে সৃষ্টি রসাতলে যায় দেখে করুণানিধান শিব সেই বিষ পান করে নীলগ্রীব নীলকণ্ঠ হলেন।

সম্পূর্ণ এই সমুদ্রমন্থন কাহিনির মধ্যে রৌদ্ররস থেকে শান্ত শিবের পরিণতি যে ভাবেই ঘটুক, কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে শিবের প্রতি বঞ্চনার অনুযোগটা এতটাই যে, তা নিয়ে পরবর্তী এক রসিক কবি অসম্ভব সুন্দর একটা রসিকতা করেছেন। তিনি বলেছেন—এটা ভেবো না যে, ভালো ভালো জামাকাপড় পরার কোনও মূল্য নেই। এটা মনে রেখো বাপু, জামাকাপড়ই এখন সমস্ত যোগ্যতার মাপকাঠি—বাসঃ প্রধানং খলু যোগ্যতায়াঃ। এই দ্যাখো না মহান সমুদ্রের কাণ্ডটা। তিনি ভগবান বিষ্ণুর পীতাম্বর বিভূষিত রূপ দেখে তাঁর হাতে তুলে দিলেন ঐশ্বর্যময়ী লক্ষ্মীকে। আর বাঘছাল পরা শিবকে যেই দেখলেন, অমনই তাঁর মুখে তুলে দিলেন বিষ—পীতাম্বরং বীক্ষ্য দদৌ স্বকন্যাং/ চর্মাম্বরং বীক্ষ্য বিষং সমুদ্রঃ। এবার বলো, জামাকাপড়টাই সব কি না?

কবি কল্প তো, সেটা আর অল্প হবে কেন? শিব বিষ খেয়েছিলেন, সমুদ্রমন্থন বিষ নিজে পান করেছিলেন—এই ঘটনাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে কবিতার কৌশলে তাঁর প্রতি বঞ্চনার ইতিহাসটা এমন রসিকতার ছলে প্রকাশ করাটা আর্টের মধ্যে পড়ে এবং সেই কবিতার আশ্রয়েই শিব আরও কত মধুর হয়ে ওঠেন রসিক কবি তা শোনাবেন—শিব কেন বিষ খেলেন তার কারণ বর্ণনা করে। এই কবির কাছে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব কিংবা সমুদ্রমন্থনের কাহিনির পৌরাণিক তাৎপর্য তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, তার চেয়ে বরং অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল শিবের বিষ খাওয়া। কেন এমন বিষ খেলেন তিনি। আমাদের সংসার জগতে লোকে যে বিষ খায়, সাংসারিক যন্ত্রণা সেখানে একটা বড় কারণ হিসাবে কাজ করে। রসিক কবি সমুদ্রমন্থন জাত বিষটাকে জুড়ে দিলেন শিবকে মানবায়িত করে।

কবি লিখছেন—শিবের ষাঁড়টি বহু ব্যবহারে এখন বুড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু বুড়ো হলেও তার ফাঁকিবাজির স্বভাব যায়নি, প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও সে পালিয়ে যায়। কিন্তু পালানোর কারণ সব সময়েই যে ফাঁকিবাজি তা নয়। শিবজায়া দুর্গার বাহন সিংহ, সে দাপিয়ে বেড়ায় শিবের দাওয়ায়, সেই সিংহের দাপাদাপিতে ভয় পেয়েই শিবের বুড়ো ষাঁড় মাঝেমাঝে পালিয়ে যায়। এদিকে শিবের ছেলে বলে পরিচিত যে কার্তিক, তাঁর বাহন আবার ময়ূর। সেই ময়ূরটি যখন ইতিউতি ঘুরে বেড়ায়, তখন শিবের গলার ভূষণ সাপগুলি বড় বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠে। বড় অসুবিধে বোধ করেন শিব। আর এদিক দিয়ে ভাবতে গেলে গণেশের ইঁদুরটিও কিছু কম যায় না। সে রেতের বেলায় কৃত্তিবসনখানি কেটে কুটিকুটি করে এবং ভিখারি শিব ভিক্ষে করে যে চাল ডাল পান সেগুলিও খেয়ে নেয় গণেশের মূষিক। নিজের সংসারের মধ্যেই এমন প্রতিকূলতা দেখে শিব আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না, তিনি বিষ খেলেন—দুঃখেনেতি দিগম্বরঃ স্মরহরো হালাহলং পীতবান্।

॥ তিন ॥

শিবের জীবনের মধ্যে, বিশেষত তাঁর সাংসারিক জীবনের কথা এতটুকুও না বলে রসিক কবির এই বিষ রসিকতার কথা আমার বলা উচিত হবে না। আর এটা তো ঠিকই যে, সেই দক্ষ-যজ্ঞের পর সতী দাক্ষায়ণী দেহত্যাগ করলেন, রুদ্র শিব দক্ষযজ্ঞ নাশ করে সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে পাগলের মতো ঘুরতে লাগলেন— স্কন্ধে প্যারোপয়ামাস হা সতীতি বদন্ মুহুঃ। শেষে তাঁর এই পাগলপারা মূর্তি দেখে ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে দিতে লাগলেন এবং তীব্র গতিতে সঞ্চারমান শিবের স্কন্ধদেশ থেকে সেই দেহখণ্ড বিভিন্ন জায়গায় পড়ে গেল। তৈরি হয়ে গেল একান্নটি শাক্ত পীঠ। কিন্তু শোকক্লিন্ন শিবের বিভ্রম তবু গেল না। পুরাণে আছে—নারদ মুনি নাকি সেই সময় বিরহী শিবকে বলেন—তুমি দুঃখ পেও না, শিব! তোমার প্রাণসমা সতী এখন পর্বতরাজ হিমালয়ের মেয়ে হয়ে জন্মেছেন। শিব বুঝি তখন শান্ত হয়ে যোগ অবলম্বন করে তপস্যায় মগ্ন হন হিমালয়ে। কবিরত্ন কালিদাস সমস্ত পৌরাণিক ভাবনার নির্মল রূপ দিয়ে এক কথায় সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন—দাক্ষায়ণীসতী যোগের দ্বারা নিজেকে দক্ষকন্যার স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরের জন্মে শৈলরাজ হিমালয়ের বধূ মেনকার গর্ভে জন্মালেন— সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা/ তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে।

সত্যি বলতে কী, মানুষ-মানুষীর মতো দেবতাদেরও জন্মান্তর আছে কি না সে কথা বললে আমরা জানাব—পরম দেবতারা বিষ্ণু, মহেশ্বর শিব হলেন 'অজ'। তাঁদের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। একই তত্ত্ব শক্তিস্বরূপিণী দুর্গা-পার্বতীর। তাঁরও জন্ম এবং কর্ম প্রয়োজন নেই। কিন্তু আবার তাত্ত্বিক দৃষ্টিতেই তাঁরা রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ বলে মানুষের মতো তাঁরা লীলায়িত হন। জন্ম কর্ম স্বীকার করেন। এই শিব-শিবানীকে নিয়ে আমাদের এত পৌরাণিক কাহিনি, এত বিচিত্র চিন্তা, একবার ভাবুন তো, সেই যে দেবী দুর্গা, মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডিকা, তাঁর কাহিনি যেখানে লেখা আছে, সেই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শিবের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর কোনও আত্মসম্বন্ধ খুঁজেই পাবেন না। কিন্তু এমন হলে কি আমাদের চলবে? আমাদের শক্তিমান শিবের তত্ত্বকে শক্তিতত্ত্বের স্বাধিকারে নিয়ে না এলে এমন কবিতা পড়ব কী করে—আলোক ছায়া শিব শিবানী সাগর জলে দোলে, অথবা ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি। পৌরাণিক কবিরা তাই শিবের জীবন তৈরি করেছেন মানবায়নী ভূমিকায়। দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেও সতীকে যেহেতু কাছে

boierpathshala.blogspot.com

পেলেন না, তাই তাঁর রুদ্র ক্রোধও শান্ত হল। তিনি সমাহিত হয়ে নিজভূমি কৈলাসে বসলেন তপস্যায়। যোগের দ্বারা নিরুদ্ধ করলেন ইন্দ্রিয়গ্রাম।

ওদিকে পর্বতরাজ হিমালয়ের সমাদরে শৈলবধূ মেনকার স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়ে উঠছেন পার্বতী। এই বড় হয়ে ওঠাটা যে কত সুন্দর হতে পারে তার অসামান্য কবিত্বময়ী বর্ণনা আছে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে। সেখানে পার্বতীর যৌবনবতী হয়ে ওঠার বর্ণনাটাকে কোনওভাবে তো অশ্লীল বলা যাবে না, অথচ 'এরোটিসিজম্'-এর এমনই কান ঘেঁষে সেটা সর্বদা চলাচল করবে যে, সেগুলিকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম কবিতা না বলে পারা যাবে না। আমরা শিবজীবনীর প্রারম্ভিক প্রাধান্যের কারণে পার্বতীর এই অমানুষী যৌবন বর্ণনার মধ্যে যাব না, কিন্তু সেখানেও কেমন করে শিবের কথা চলে আসে, সেটা কালিদাসই পারেন তাঁর ব্যঞ্জনা বিদগ্ধতায় প্রকাশ করতে। হাত, পা, গলা, বুক সব বর্ণনা শেষ করার পর কালিদাস আপন কবিজনোচিত সৌজন্যে পার্বতীর 'নিতম্ব' কথাটিও উচ্চারণ করলেন না, কিংবা অন্য কোনও অঙ্গুলি-চিহ্নিত শব্দও ব্যবহার করলেন না। তিনি বললেন—আমরা অনুমান করতে পারি তাঁর এই প্রত্যঙ্গ সৌন্দর্যের শোভা—সেই অঙ্গ, যেখানে সোনার কাঞ্চীগুণের বন্ধনী চাপায় মেয়েরা। পার্বতীর এই বিশেষ প্রত্যঙ্গ শোভা অন্য রমণীরা কামনা করে এবং তা কতটা সুন্দর, তার প্রমাণ-প্রতীক একটাই যে, পরবর্তী সময়ে স্বয়ং গিরিশ শিব পার্বতীর এই প্রত্যঙ্গটি আপন অঙ্কে ধারণ করে পুলকিত হয়ে উঠবেন—আরোপিতং যত্ গিরিশেন পশ্চাদ্/ অনন্যনারী-কমণীয়মঙ্কম্।

আমরা পার্বতীর যৌবনোদ্ভেদী বর্ণনার প্রয়োজন বোধ করছি না। বরঞ্চ তপস্যারত শিবকে নিয়ে আমাদের চিন্তা অনেক বেশি। পূর্বজন্মের সতী-শিবের মিলন কী করে যে আবার সম্পন্ন হবে তার জন্য আবারও তপস্যায় বসে পৃথিবী, শক্তিমান-এর সঙ্গে শক্তির তাত্ত্বিক মিলন তো জন্ম জন্মান্তর ধরে হয়ে আছে।, এখন তাঁদের মুনুষ্য প্রত্যক্ষে মিলিয়ে দেবার জন্য স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। সুযোগও এসে গেল অচিরেই। স্বর্গে তারকাসুরের অত্যাচার আরম্ভ হল। তারকাসুর ব্রহ্মাকে তপস্যাতে সন্তুষ্ট করে বর পেল—ব্রহ্মার সৃষ্ট জগৎ দানব মানব অসুর দেবতা কেউ যেন তাঁর সমান শক্তিশালী না হয়। আর দ্বিতীয় বর চাইল—শিবের শক্তিতেজ থেকে উৎপন্ন পুত্র যখন সেনাপতি হবে, তাঁর অস্ত্রাঘাতেই মৃত্যু হবে তারকাসুরের। ব্রহ্মা দুই বর দিতেই তারকাসুরের তেজ এতটাই বেড়ে গেল যে, তাঁকে আর কষ্ট করে যুদ্ধটুদ্ধ করতে হল না স্বর্গজয়ের জন্য। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা তাঁদের ঘরের শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলি নিজে থেকেই দিয়ে দিলেন অসুররাজার হাতে। ইন্দ্র দিলেন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, যম দিলেন দণ্ড, কুবের দিলেন গদা, সমুদ্র দিলেন রত্ন। সব কিছু পেয়ে ঐশ্বর্যে, সমৃদ্ধিতে, শক্তিতে তারকাসুর চরম অত্যাচারী হয়ে উঠলেন।

দেবতারা এবার ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বিহিত চাইলেন। ব্রহ্মা বললেন—আমারই বরে যার বৃদ্ধি ঘটেছিল আমিই তাকে শেষ করতে পারি না। তবে একটা উপায় তো আছে এবং সেটাতেই দেবকার্য সিদ্ধ হবে। শিবের তেজ থেকে যে পুত্র জন্মাবে সেই তারকাসুরকে হত্যা করবে। এখানে একটা গুরুতর কাজ তোমাদেরই করতে হবে। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন—শিব এখন তপস্যা করছেন হিমালয়ে, আর নারদের নির্দেশে পার্বতী প্রতিদিন একবার করে শিবের কাছে গিয়ে তাঁর সেবা পরিচর্যা করে বাড়ি ফেরেন। এখন এই শিবের সঙ্গে যদি পার্বতী উমার মিলন ঘটিয়ে দিতে পারো, তবে তাঁদের মিলনসঞ্জাত পুত্রই তারকাসুরের হন্তা হবে।

তপস্যারত যোগী শিবকে পার্বতীর প্রতি নিবিষ্ট করাটা খুব সহজ কাজ ছিল না। দেবরাজ ইন্দ্র ভাবতে বসলেন কীভাবে কার্যসিদ্ধি ঘটবে। ঠিক এই জায়গার কথকতায় আমরা সত্যিই দোটানায় আছি; কেননা, এই ঘটনার বর্ণনা শিবপুরাণেও আছে আবার কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যেও আছে। পুরাণের নাম শুনেই কেউ কেউ ভাবেন কালিদাস পুরাণ থেকেই তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শিবপুরাণটা কালিদাসের কালের আগে লেখা হয়েছে বলেও অনেকেই ভাবেন না। ফলত কালিদাস আপন আরাধ্য দেবতা শিবের ব্যাপারে কখনওই গাঁজাখুরি গপ্পো ফাঁদবেন না—এটা ভেবে নিয়েই আমাদের উচিত বরং কুমারসম্ভবের কবিকেই অনুসরণ করা। তাতে শিব শিবার মিলনে দেবরাজ ইন্দ্র কী প্রয়াস নিলেন—এটা জানাটা যদি আমাদের মুখ্য অন্বেষণ হয়, তাহলে কালিদাসী কবিত্বের অবান্তর ফলটুকু আমরা পেয়ে যাব।

রাজা হিসাবে ইন্দ্র জানেন তাঁকে কী করতে হবে। এ তো অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ নয় যে, বরুণের পাশ, কি যমরাজার কালদণ্ড এখানে কাজে লাগবে। এ হল শিবের মতো যোগসমাধিগ্রস্ত পুরুষের চিত্তবিক্ষেপ তৈরি করা। কালিদাস রাজসভার কবি বলে রাজাদের স্বভাব নিয়ে একটা তির্যক মন্তব্য করেই দিয়েছেন। শিবপুরাণ সহজে বলেছে—ব্রহ্মার কাছ থেকে চলে এসেই ইন্দ্র ভাবলেন—এ আর এমন কঠিন কী কাজ, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সকলের চিত্তবিক্ষেপকারী দেবতা কন্দর্প মদনকে ডাকলেন। কিন্তু কালিদাস মন্তব্য করলেন—ইন্দ্র তাঁর বিরাট মহান দেবতাদের সবাইকে ছেড়ে কামনার দেবতা কন্দর্পমদনকে ডেকে পাঠালেন এই জন্যই যে, বড় মানুষদের ব্যাপারই আলাদা, সময় আর কাজ বুঝে কখন যে কোন লোকটাকে তাঁরা বুকে জড়িয়ে ধরবেন, তার কোনও ঠিক নেই—প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভূণাং/ প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু। এটা বোধহয় একটা মনস্তত্ত্বের বিষয়ই বটে যে, নিম্নস্তরের মানুষকে চরম পদাধিকারী যদি একবার স্বপ্রয়োজনে মাথায় তুলে দেন, তবে সে নিজের বিজ্ঞপ্তি করতে থাকে বহুল পরিমাণে।

কন্দর্প মদন ইন্দ্রকে বললেন—কী দরকার বলুন তো আমাকে। কেউ কি আপনার এই ইন্দ্রপদ লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা করছে, তেমন হলে বলুন। আমার এই পুষ্পবাণ তার দিকে তাক করতে দেরি হবে না আমার। কোনও মানুষ মুক্তিমার্গের তপস্যায় বসে থাকলেও সুন্দরীদের সামান্য বাঁকা কটাক্ষেই তার মোক্ষসন্ধি ঘুচিয়ে দিতে পারি আমি। আপনি চাইলে একটা মানুষের অর্থ ধর্মের সব ইচ্ছা কামনার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়াটা আমার কাজ। আর শেষে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি! দেবরাজ! এটা আপনার নিজের কোনও ব্যাপার নয় তো? এমন তো নয় যে, এক রমণী ভীষণ পতিব্রতা বলে পাতিব্রত ধর্মের জন্য অস্খলিত চরিত্রের বড়াই করছে আপনার কাছে। অথচ সেই রমণীটিকে আপনি চাইছেন মনে মনে।। এমন হলে বলুন, সেই সুন্দরী সমস্ত লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজে থেকে এসে জড়িয়ে ধরবে আপনার গলা—আমি ব্যবস্থা করব নিতম্বিনীমিচ্ছসি মুক্তলজ্জাং/ কণ্ঠে স্বয়ংগ্রাহ-নিষক্তবাহুম্। কামনার দেবতা ঠিক জায়গাটাই ধরেছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের এমন পুরাণপ্রসিদ্ধ লাম্পট্যগুণ কিছু আছে। কিন্তু মদনদেব ইন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গিয়ে বলল—আপনি চাইলে আমি কী না করতে পারি! আমার বাণগুলি আপনার মতো বজ্রসংকাশ নয় তো বটে, কিন্তু আমার ফুলধনুতেই এমন শক্তি আছে যে, আমার বন্ধু ঋতুরাজ বসন্তকে সঙ্গে পেলে আমি স্বয়ং

boierpathshala.blogspot.com

মহাদেবেরও ধৈর্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারি. অন্য কোনও ধনুকধারী আমার ধারে কাছে আসতে পারবে না।

ইন্দ্র বুঝলেন—তাঁর কাজ প্রায় হয়েই গেছে। ফলে অধম স্তরের দেবতাকেও সখা সম্বোধন করে বললেন—তুমি যা বলছ, সব ঠিক। এমনকী আমার বজ্র শত শত অসুর দানবকে হত্যা করতে পারলেও সংসার বিরাগী তপস্বীদের ওপর সেটা মোটেই কাজ করে না। কিন্তু তোমার যে অস্ত্রখানি, তার গতি সব জায়গায়, এবং সে অস্ত্র কার্যের সাধন করে ছাড়ে—ত্বং সর্বতোগামী সাধকঞ্চ। দ্যাখো বন্ধু! আমি তোমার ক্ষমতা জানি বলেই একটা খুব বড় কাজে তোমাকে আমি নিয়োগ করতে চাই। তুমি যে একবার একটা কথা বললে—বললে নাকি যে, বৃষবাহন শিবের ওপরেও তোমার পুষ্পধনুর শক্তি কাজ করে—আমি মনে করি ওতেই তুমি আমার নিয়োগটুকু স্বীকার করে নিয়েছ। তোমাকে জানাই—দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য শিববীর্যে সমুৎপন্ন একজন দেবসেনাপতি চান। কিন্তু এদিকে মহাদেবকে দ্যাখো, তিনি এখনও পরব্রহ্মে লীন হয়ে আছেন বলে মনে হচ্ছে। সেই সংযত যোগী যাতে হিমাদ্রিকন্যা পার্বতীর প্রতি অনুরক্ত হন, তোমাকে সেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমার কাছে খবর আছে, বস্তুত আমার গুপ্তচরী অপ্সরারাই আমাকে খবর দিয়েছে যে, সেই পার্বতী তাঁর পিতার অনুমতিক্রমে প্রতিদিনই পর্বতশিখরে মহাদেবের পরিচর্যা করতে যান। অতএব এইবার তোমার কাজ, দেবকার্য সিদ্ধির জন্য কাজে লেগে পড়ো—তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্যম্।

আমার পাঠকেরা যাঁরা বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা পড়েছেন, দেখবেন সেখানে একটা বিশেষ অধ্যায়ের সূত্রপাঠ হিসাবে এই শ্লোকার্ধটি নিবেশ করা হয়েছে। বস্তুত এই দেবকার্য যে কতটা কঠিন, তা যে সম্পন্ন করতে যায় সে নিজেও আগে টের পায় না। ইন্দ্র দেবরাজ তো ভারী মিষ্টি করে মদনদেবকে বললেন—দেবতারা যাচনা করছে তোমার কাছে, কাজটাও জগতের মঙ্গলের জন্য, কাজটা হয়েও যাবে তোমার ফুলধনু ছোঁয়ায়, তাছাড়া কোনও হিংসার কাজও তো নয় এটা। তুমি তোমার কাজের জন্য তোমার বসন্তসখাকে সহায় চেয়েছিলে, সে তো এমনিই যাবে তোমার সঙ্গে, না বললেও যাবে, আগুন যখন লাগে তখন হাওয়াকে বলে দিতে হয় নাকি যে, যাও একটু হাওয়া দাও আগুনকে। অতএব যাও। আর দেরি নয়।

দেবরাজের আদেশ মাথায় নিয়ে মদন তার বসন্তসখা আর স্ত্রী রতিদেবীকে নিয়ে চলে এলেন সেইখানে, যেখানে তপস্যায় রত আছেন শিব। খেয়াল করে দেখুন, এও কিন্তু এক সৃষ্টির উল্লাস। এই যে শব্দটা 'মদন'— শব্দটা এখনকার দিনে বিদ্রূপেই ব্যবহৃত, কিন্তু এই শব্দের মূল ধাতু 'মদ্'-এর অর্থ তো মত্ত করে তোলা—উন্মত্ত বা উন্মাদ তো এটারই বাড়াবাড়ির জায়গা। আমাদের, রসশাস্ত্রকারেরা যে শৃঙ্গার রসের কথা বলেছেন, একমাত্র এই রসই তো নরনারীকে মত্ত করে এবং এই শৃঙ্গার রসের স্থায়ী ভাব হল রতি—যাকে আমরা মদনের স্ত্রী বলে জেনেছি। শৃঙ্গার রসের বিস্তারের জন্য আলম্বন হিসাবে দুটি নায়ক-নায়িকা লাগে—এখানে সেটা শিব পার্বতী। এই রসের উদ্দীপন বিভাব বসন্ত—এখানে তাও আছে। তার মানে, আমরা বস্তুত শৃঙ্গার রসের বিস্তার নিয়েই কথা বলছি, যেখানে 'ক্রাইসিস্' হল এই যে, এক অনুদ্যোগী অন্যসংকল্পে আবিষ্ট পুরুষকে এক রমণীর মাধ্যমে উন্মুখী করাতে হবে শৃঙ্গারচেষ্টায়।

মদনদেবের প্রকল্পে সদা সহায় বসন্ত হিমালয়ের উপত্যকা ভূমিতে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকট করে তুলতেই অশোক কর্ণিকারের মতো অসামান্য পুষ্পশোভায় ভরে উঠল বনভূমি। মধুকর আর কোকিলের আলাপে যেন শৃঙ্গারমন্ত্র উচ্চারিত হল। আমরা যদি কালিদাসী ভাবে এখানে সেই অকাল বসন্তের

boierpathshala.blogspot.com

শোভা বর্ণনা করতে যাই, তাহলে কবিত্বের মহিমায় আমরা মুখর হয়ে উঠব এখানে তাতে মৌল প্রস্তাব যাবে হারিয়ে। বরঞ্চ আমরা একেবারে উপসংহারে চলে এসে জানাই যে, কামনার দেবতা শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের মূল্যে শিবের সঙ্গে পার্বতীর এমন একটা মিলন সংঘটনা রচনা করতে পারলেন, যেখানে শারীরিক আসঙ্গলিপ্সার মোহটুকু মুখ্য হয়ে উঠল না বটে, কিন্তু সেটা যে একটা বিরাট বিস্ফোরণের মতো নর-নারীর জীবনে অনস্বীকার্য এক চমৎকার, সেটাও সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাঁর সর্বাঙ্গীণ চেষ্টার মধ্য দিয়ে।

ঘটনাটা এই ঘটল শেষ পর্যন্ত যে, চতুর্দিকে এই বিশাল বাসন্তিক আয়োজন করার পরেও কামনার দেবতা সভয়ে দেখলেন যে, শিব যেখানে বসে তপস্যা করছেন, সেখানে শিবের সমাধির মতোই গাছের পাতা যেন নড়ে না, ভ্রমরপঙক্তি নিশ্চল, পক্ষীকুল নীরব, চপল হরিণ পর্যন্ত সেখানে দৌড়াদৌড়ি বন্ধ করেছে। সুদূরপ্রান্ত থেকে মনোবিভ্রমকারী অপ্সরাদের সংগীত ভেসে আসছিল বটে, কিন্তু ধ্যাননিষ্ঠ যোগী শিবের কানে সে সব প্রবেশ করল না। ওদিকে লতাগৃহের দ্বারে শিবপার্ষদ নন্দী হাতে চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবানুচর প্রমথগণের উদ্দেশে মুখে তর্জনী স্থাপন করে নিষেধ করলেন—একটুও যেন চপলতা না হয়—মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ।

ঠিক এইরকম একটা নিবাত নিষ্কম্প তপোভূমির মধ্যে কামনার দেবতা মদন নন্দী এবং মহাদেবের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনওমতে শিবের সমাধিস্থলে ঢুকল। সে দেখতে পেল মহাদেবকে—বীরাসনে উপবিষ্ট তাঁর শরীরের ঊর্ধ্বভাগ নিশ্চল, সরল এবং সমুন্নত, দুই স্কন্ধ সংনদ্ধ স্থির, দুই হাত কোলের উপরে উত্তানভাবে রাখা। মাথার বিপুল জটাভার তিনি ভুজঙ্গ-বন্ধনে বেঁধে নিয়ে চূড়ার মতো উঁচু করে রেখেছেন মাথার ওপর। তাঁর পরিধানে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম। শরীরের মধ্যে সমস্ত বায়ু নিরুদ্ধ করে নয়নত্রয় যেভাবে নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করেছিলেন, তাতে তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন বর্ষণাড়ম্বরহীন জলধর মেঘ, যেন তরঙ্গ-সংঘাতহীন স্থির হ্রদ, যেন বায়ু প্রচারহীন নিষ্কম্প প্রদীপ—অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্/ নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।

শিবের এই চেহারাটা দেখলেন কামদেব। তিনি বুঝলেন—মনের শক্তিতে কিছুই করা যাবে না এঁকে। তিনি নিজে মনসিজ, মনোভাব, মনোমথ হওয়া সত্ত্বেও সেই মন এই নিশ্চল যোগীর মনে সঞ্চারিত করা যাবে না। তাঁর ভয় ভয় করতে লাগল। ভয়ে অবসাদে তাঁর হাত থেকে পুষ্পধনুক এবং বাণ কখন খসে পড়ে গেছে, তিনি বুঝতেই পারেননি। তাঁর শরীর মনের সব শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে, এই অবস্থায় সুবর্ণ সুযোগের মতো হঠাৎই এই সুন্দরী অরণ্যভূমির মধ্যে দেখা গেল পর্বতরাজকন্যা পার্বতীকে।

আজ পার্বতীর বেশভূষা খানিক বেশি। বনস্থলীতে অকাল বসন্তের উদয় হয়েছে, ফলে অশোক, কর্ণিকার, সিন্ধুবার কোনও কিছুই বাদ পড়েনি তাঁর শরীর-মণ্ডনে। প্রথম সূর্যের রাঙা আলোর মতো তাঁর পরিধেয় বস্ত্র, স্তনভারে ঈষৎ যেন আনত হয়ে হাঁটছেন তিনি, আর কামনার দেবতা তাঁর পুষ্পধনুর ছিলার মতো বকুলমালাখানি বেঁধে দিয়েছেন যেন নিতম্বদেশে, সেই কাঞ্চীগুণ খালি খসে-খসে পড়ে যাচ্ছিল বলে সেটা বারবার স্বস্থানে স্থাপন করবার চেষ্টা করছিলেন পার্বতী—স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা/ পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্। আমরা কালিদাসের এই অসাধারণ বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি যে, তিনি তাঁর আলম্বনী নায়িকার মধ্যে শৃঙ্গারোজ্জ্বল বেশের অবতারণা করে কামনার দেবতার সহায় হয়ে উঠছেন। এমন সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে দেখে মদন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, কেননা ধ্যানমগ্ন শিবকে দেখে তাঁর যতটা ভয় তৈরি হয়েছিল, সুন্দরী পার্বতীকে দেখে তিনি নিজের কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে অনেকটাই আশান্বিত হয়ে উঠলেন।

পার্বতী শিবের সমাধিকুটিরের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হলেন। প্রতিদিনই তিনি আসেন, সে খবর আমরা আগেই পেয়েছি—গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী। আজও এসেছেন। দৈনন্দিন এই বিরাগী যোগীর সামনে একবার যে-সময় এসে তিনি উপস্থিত হন, সেই সময়টাও এমন যে, প্রাণায়াম-পরায়ণ শিব সেই সময়েই তাঁর যোগ-নিরুদ্ধ বায়ুগুলি শরীর থেকে মুক্ত করেন এবং অল্প সময়ের জন্য তাঁর সমাধির আসনটুকু ত্যাগ করে যোগাসন ভঙ্গ করেন। পার্বতী এই সময়টা জানেন বলেই এই সময়েই প্রতিদিন আসেন এখানে। আর পার্বতী আসা মাত্রেই দ্বারপাল নন্দী এসে জানালেন—এসেছেন শৈলসুতা পার্বতী। নন্দী তাঁকে ভ্রূভঙ্গিতে প্রবেশও করিয়ে দিলেন সমাধিকুটিরের মধ্যে।

পার্বতীর দুই সখী নবোদ্গত বসন্তের সমস্ত ফুল শাখাভঙ্গ করে নিয়ে এসেছিল। তারা সেগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে দিল শিবের পায়ের কাছে—পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লবভঙ্গভিন্নঃ। আর ওদিকে লাস্যময়ী উমা মহাদেবের পায়ে আনত হয়ে প্রণাম করতেই তাঁর কালো চুলে গোঁজা কর্ণিকার ফুলগুলি খসে পড়ল তাঁর পায়ের উপর। কামনার দেবতা এমন দৃশ্য দেখে আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না, তিনি ভাবলেন—এই সেই স্পৃহনীয় মুহূর্ত, তিনি বারবার তাঁর পুষ্পধনুর ছিলা স্পর্শ করতে লাগলেন। এদিকে শিব-মহাদেব সমাগতা পার্বতীর এমন মধুর শরণাগতি দেখে আশীর্বাদ করে বললেন—তুমি যেন এমন স্বামী পাও জীবনে যে তোমা বই আর জানবে না—অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি। পার্বতী মন্দাকিনীর জলজাত শুষ্ক পদ্মবীজের মালা একখানি নিয়ে এসেছিলেন মহাদেবের জপের জন্য। পার্বতী তাঁর তাম্ররক্ত হাতখানিতে সেই মালা নিয়ে যখন শিবকে দিতে চাইছেন এবং মহাদেবও যখন অনুগ্রহের আগ্রহে সেই পদ্মবীজের মালাটি গ্রহণ করতে চাইছেন, সেই মুহূর্তেই ভালোবাসার দেবতা তাঁর সম্মোহন বাণটি ছেড়ে দিলেন দুজনকে উদ্দেশ্য করে—সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা/ ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্।

কামনার দেবতার অমোঘ বাণ এটা, কোথাও এ বাণ ব্যর্থ হয় না। আকর্ষণ, বশীকরণ-এর চেয়েও বেশি হল—এই অব্যর্থ বাণ সম্মোহিত করে নারী-পুরুষকে এবং মুহূর্তের জন্য হলেও বড় মানুষেরও অনেক সময় স্খলন ঘটে এই সময়ে। হয়তো বা ঘটে যায় সেই অপরিশীলনে ঘটনাটুকু, যা বাঞ্ছিত ছিল না। মহাযোগী শিবের কী হল এখন। মনে হল যেন ঈষৎ তাঁর ধৈর্য নষ্ট হয়েছে, চাঁদ উঠলে পরে যেমন আস্তে আস্তে জোয়ার আসে, তেমন—চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ। হঠাৎ দেখা গেল তাঁর পূর্বাপর কাজের মিল থাকছে না, যিনি হাতে করে উমা-পার্বতীর কাছ থেকে জপসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শুষ্ক পদ্মবীজের মালা নিচ্ছিলেন, তখন হঠাৎই তাঁর তিনখানা চোখই একসঙ্গে গিয়ে পড়ল পার্বতীর বিম্বফল-সদৃশ অধরোষ্ঠের ওপর—উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে/ ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি। আর চোখ নাকি দার্শনিক দৃষ্টিতে বড় ভয়ংকর ইন্দ্রিয়, সে নাকি মুহূর্তে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। রসশাস্ত্রীয় ভাবনায় এইখানেই শৃঙ্গার-স্থায়ীভাব রতির উদ্‌বোধন ঘটে যায়, সেখানে

boierpathshala.blogspot.com

এক সুন্দরী রমণীর 'বদনমণ্ডলমধ্যবর্তী' অধরোষ্ঠের ওপর এই বিলোচনী দৃষ্টিপাত রতি-ব্যভিচারী ঔৎসুক্য, আবেগ, চপলতা এবং হর্ষের লক্ষণ তৈরি করে দেয়।

শিবের এমন হল, তাতে পার্বতীর কেমন অবস্থা। মহাকবি লিখেছেন—শৈলসুতা পার্বতীর শরীরের মধ্যে ফুটে উঠল 'ভাব'। ভাব নাকি নির্বিকার চিত্তের মধ্যে কামনার প্রথম বিক্রিয়া। সেই ভাবের চেহারাটা কীরকম? অনবদ্য ভাষায় কবি লিখেছেন—অঙ্গৈঃ স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্পৈঃ। বর্ষামুখর দিনগুলি আসার আগেই ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে আসা কদম ফুলের সমস্ত রোঁয়াগুলি নাকি একসঙ্গে স্ফুটিত হয়। পার্বতীর সমস্ত শরীরে সেই বাল-কদম্বের রোঁয়ার মতো কাঁটা দিয়ে উঠল যেন। ভেবে দেখুন, ভারতবর্ষের উত্তরাধিকারী কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন এই ভাব—বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান—বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবম্/ অঙ্গৈঃ স্ফুরদ্‌বাল-কদম্বকল্পৈঃ। কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ এই মাধবী পরিবেশের মধ্যে, ফুলদলবিকাশী বনস্থলীর মধ্যে যোগী ভিখারির এই চঞ্চল দৃষ্টিপাত—পার্বতীর গায়ে কদম ফুল ফুটে উঠল, স্ত্রী-শরীরের প্রথমাভিলাষ ব্যক্ত হয়ে উঠল যেন। তিনি লজ্জা-লজ্জা মুখে সরে দাঁড়ালেন সামান্য, দাঁড়ানোর ভঙ্গি বাঁকা, নয়ন বাঁকা—তাঁকে আরও বেশি সুন্দর লাগছিল তখন—সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ/মুখেন পর্যস্ত-বিলোচনেন।

পুরাণের কবি কালিদাসের মতো ব্যঞ্জনা-মধুর নন বলেই, কিংবা অতিসরল বলেই এই জায়গাটায় যোগীশ্বর শিবকে একটু বেশি ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছেন, শিব এখানে কথামুখে পার্বতীর শরীর-সৌন্দর্য বর্ণনা করে ফেলেছেন সামনা-সামনি, এবং হঠাৎ করে পার্বতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু আঁচলে হাত পড়া-মাত্রেই পার্বতী স্ত্রী-স্বাভাবিক লজ্জায় একটু সরে দাঁড়িয়েছেন বটে, কিন্তু তাই বলে তাঁর অন্তর্গত অভিলাষের হাব-ভাব স্তব্ধ হয়ে গেল না মোটেই—হস্তং বস্ত্রাঞ্চলে যাবৎ তাবচ্চ দূরতো গতা। শিব ভাবলেন—এমন সুন্দর মোহন যার রূপ, তাকে আলিঙ্গন করলে না জানি কত সুখ হবে—যদ্যালিঙ্গনম্ এতস্যাঃ করোমি কিং পুনঃ সুখম্! ঠিক এই রকম একটা মুহূর্তেই কিন্তু চেতনায় ফিরে এলেন শিব। এতকালের জিতেন্দ্রিয়তার অভ্যাসে তিনি নিজেকে দৃঢ়ভাবে সংযত করেই তাঁর এই আকস্মিক চিত্তবিকারের হেতু খুঁজতে লাগলেন তিনি। চতুর্দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই যোগীশ্বর মহাদেব দেখতে পেলেন কামনার দেবতা কন্দর্পকে। তিনি আবারও ধনুক উদ্যত করেছেন বাণ ছোঁড়ার জন্য। শিব ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁর তৃতীয় নয়নের আগুন জ্বলে উঠল ধিকি-ধিকি করে। তিনি তাকালেন মদনদেবের দিকে—স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদ্/ অক্ষ্ণোঃ কৃশানোঃ কিল নিষ্পপাত। দেবতারা আকাশ থেকে সভয়ে চিৎকার করে উঠলেন সকলে—ক্রোধ সংবরণ করুন, প্রভু! ক্রোধ সংবরণ করুন। কিন্তু সে-শব্দ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পার্থিব স্তরে পৌঁছনোর আগেই শিবনেত্র-বহ্নি মদনকে ভস্মে পরিণত করে ফেলল—তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা, ভস্মাবশেষঃ মদনং চকার।

মদন ভস্ম হলেন এবং শিব-মহাদেব তাঁর শৈল আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেলেন কোথায়, কে জানে! শৈলদুহিতা পার্বতী ফিরে এলেন গৃহে। মদনভস্মের পর মদন-পত্নী রতির বিলাপ ছিল এতটাই মর্মান্তিক যে, মহাকবি কালিদাসকে এক অধ্যায় জুড়ে বিয়োগিনী ছন্দে সেই বিলাপ লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে কবিজনোচিত বেদনায়। আমাদের মহাকবি পর্যন্ত বিগলিত করুণায় লিখেছেন—ধ্বনিয়া উঠিল নিখিল বিশ্ব রতিবিলাপ-সঙ্গীতে। এই কাতরতা বৃথা যায়নি। কামনার দেবতা আর রূপ ধারণ করতে পারলেন না বটে, কিন্তু বিশ্বময় মানুষের মনোভূমিতে অনঙ্গ হয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি।

এদিকে সবচেয়ে কষ্ট পেলেন পার্বতী। এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে নিজের রূপের ওপরেই বিতৃষ্ণা ধরে গেল তাঁর। মনে হল বুঝি যোগীশ্বর মহাদেবের এই স্খলন তাঁর রূপের জন্যই হয়েছে। তিনি ঠিক করলেন—তপস্যা করে শরীর শোষণ করে তপোবলেই তিনি শিবকে স্বামী হিসেবে লাভ করবেন। পার্বতীর সখীরা হিমালয়ের কাছে প্রিয়সখী পার্বতীর সিদ্ধান্ত জানাল। হিমালয় অনুমতি দিলেন, কিন্তু মা মেনকার বুক ফেটে গেল সুকুমারী পার্বতীকে তপঃক্লেশ সহ্য করার অনুমতি দিতে। উমা পার্বতী কোনও বারণ মানলেন না এবং গৌরীশিখর নামে একটা জায়গায় তপস্যা করতে চলে গেলেন। আমরা আপাতত পার্বতীর তপস্যা-পর্ব, ছদ্মবেশে শিবের আবির্ভাব এবং সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে পার্বতীর সংলাপের বিবরণও দিতে চাই না, তাতে এই লেখার কলেবর বৃদ্ধি হবে। শুধু এইটুকু জানাই যে, শিব কিন্তু পার্বতীর প্রেমের পরীক্ষা নিলেন অনেক। ইন্দ্র ইত্যাদি ঐশ্বর্যশালী দেবতাদের ছেড়ে কেন তিনি শিবের মতো এক দেবতার উপাসনা করবেন—যার চালচুলো নেই, পরিধান নেই, উত্তম বাহন নেই, বাসস্থানের ঠিক নেই, তেমন মানুষকে কি কেউ স্বামী হিসেবে বরণ করে?

এসব কথা শুনে পার্বতী কানে আঙুল দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যেমনই হোন তিনি—গজাজিনালম্বী/ দুকূলধারী বা আমি তাঁকেই স্বামী হিসেবে চাই। শিব প্রকাশ করলেন নিজেকে, পার্বতী বুঝলেন—তাঁর তপস্যা সফল হয়েছে। কামনা প্রেমে পরিণত হল, মর্ত স্বর্গে পরিণত হল। পার্বতীর সখীরা অনুযোগ করে বলল—বিয়েই যদি করতে হয় আমাদের সখীকে, তাহলে লোকাচার অনুযায়ী পার্বতীর পিতার কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হবে আপনাকেই—বিবাহস্য যথা রীতিঃ কর্তব্যং তৎ তথা ধ্রুবম্। শিব স্বীকার করে নিলেন—তাই হবে। তারপর সপ্তর্ষিদের কাছে গিয়ে নিজের মনোবাঞ্ছা জানিয়ে হিমালয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন তাঁদের মাধ্যমেই।

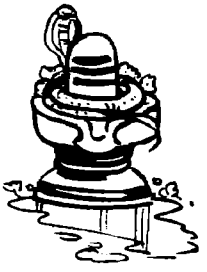

সপ্তর্ষিরা চলে যেতে নারদ-মুনিকে স্মরণ করলেন শিব। নারদ আসতেই শিব বললেন—পার্বতীর তপস্যায় আমি তাঁর বশীভূত হয়েছি। আমি তাঁকে বিবাহ করব বলে ঠিক করেছি। এই অবসরে তুমি একটা কাজ করো। তুমি সমস্ত দেবতাদের নিমন্ত্রণ করে আসবে—কেউ যেন বাদ না যায়, গন্ধর্ব, যক্ষ, মাতৃকাগণ, ঋষিগণ, কেউ যেন বাদ না যায়। আর মনে রেখো, এই বিয়েতে যারা না আসবে, তারা কেউ আমার লোক বলে গণ্য হবে না—নাগমিষ্যন্তি যে'প্যত্র মদীয়া ন কদাচন।

আপনারা লক্ষ করবেন বৈরাগ্য, তপস্যা, ধ্যান, মন্ত্রের জগৎ থেকে এই প্রথম আমরা এক সঠিক পৌরাণিকের লৌকিক জগতে এসে পড়লাম। এখানে দেবতাসুলভ সিংহাসন নেই, অলৌকিকতার আবরণ নেই, অন্তরীক্ষ লোকের গম্ভীর অভিসন্ধি নেই। আছে মর্তসুলভ মান, অভিমান, ভালোবাসা, ক্রোধ, অভিযোগ এবং হাস্য। এই পর্যায়েই দেখা যাবে যে, এখানে পরম দেবতার জীবন-ঘটনা চলছে আমাদেরই সংসার জীবনের মতো। তবে সেখানে দেবত্বের অবসরটুকু এইরকম যে, দুঃখ, কষ্ট, কারুণ্যের অনন্ত ঘটনার মধ্যে দেবদেব মহাদেবের সমস্ত ব্যবহার 'শিবহাস-সহোদর' এক দৈব চমৎকারের জন্ম দেবে। অবাক লাগবে এই কথা ভেবে যে, একটি বিবাহ-উৎসবের জন্য আমাদের উৎসাহ-আড়ম্বর শুরু হয়, ঠিক তেমনটাই কিন্তু শুরু হল দুই বাড়িতে—শিবের বাড়ি এবং হিমালয়ের বাড়িতে।

boierpathshala.blogspot.com

দেবতারা শিবের কাছে আভরণ-ভূষণ পাঠালেন অনেক, তবে শিব যে সে-সব খুব ব্যবহার করে নিজের শোভাবর্ধন করলেন, তা নয়। তিনি যেমন ছিলেন তেমনই রইলেন। দেবতারা—বিষ্ণু-ব্রহ্মা থেকে ইন্দ্র, যম, বরুণ সব নিজের নিজের বাহনে এসে উপস্থিত হলেন। কৈলাস-ভবনে অপ্সরারা নাচতে আরম্ভ করলেন। গন্ধর্বরা গান ধরলেন, বাদ্যি বাজতে লাগল ,নাচগানের তালে তালে। বরযাত্রার সময় শিব যখন বেরচ্ছেন, তখন দেবতাকুলের বরযাত্রীদের সামনে রাখলেন শিব। একে একে তাঁরা বেরতে আরম্ভ করলেন কৈলাস থেকে— নিঃসসার ততস্তস্মাৎ কৈলাসাৎ পর্বতোত্তমাৎ। ওদিকে হিমালয়ের ঘরে আড়ম্বর আরও বেশি। সমস্ত আত্মীয় পর্বতেরা হিমালয়ের বাড়িতে জঙ্গম-রূপ ধারণ করে। হিমালয় তাঁদের মধ্য থেকে গন্ধমাদন পর্বতকে বেছে নিয়ে শিবকে কৈলাস থেকে নিয়ে আসবার জন্য পাঠালেন। হিমালয়ের বাড়ির উঠোনে বিবাহ-বেদির কাছে তোরণ লাগিয়ে বিয়ের মণ্ডপ তৈরি হল। হিমাদ্রিপত্নী মেনকা অনেক সেজেগুজে নারদমুনির সঙ্গে গৃহের সর্বোচ্চতলে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর মনের মধ্যে এই উত্তেজনা কাজ করছে যে, তাঁর মেয়ে এত উগ্র তপস্যা করে যাঁকে পছন্দ করেছে, সেই দেবদেব না জানি কত সুন্দর এবং কতটা ঐশ্বর্যশালী হবেন।

দেবতারা একে একে হিমালয়ের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছেন। প্রথমে ঢুকলেন গন্ধর্ব বিশ্বাবসু, তাঁর সঙ্গে নৃত্যপরা সব অপ্সরারা। ঠাটবাট দেখে মেনকা ভাবলেন—ইনিই শিব। নারদমুনি অতি তাচ্ছিল্যে মেনার ভুল ভেঙে দিয়ে বললেন—এ তো দেবতাদের গায়েন একজন। ইনি কখনওই রুদ্রশিব নন। মেনার ভালোই লাগল—তাহলে এঁর থেকেও বেশ কিছু হলেন শিব। প্রবেশ করলেন ধনপতি কুবের, তারপর বরুণ, তারপর যম—প্রত্যেকের শোভা এবং ঐশ্বর্যভাব পূর্বের দুগুণ। মেনা ভারী খুশি হচ্ছেন, শিব না জানি কী হবেন? তারপর প্রবেশ করলেন দেবরাজ ইন্দ্র। নারদ বললেন—ওঁকে ভুলেও রুদ্র বলে ধরে নেবেন না, ইনি শিবের কিংকরমাত্র। একইভাবে সূর্য, চন্দ্র সকলেই নাকচ হয়ে গেলেন নারদের বাচালতায়, তখন মেনকা রানি একেবারে কল্পনার উচ্চযানে চেপে বসলেন। ভাবলেন—ধন্যি মেয়ে আমার। এই সব ঐশ্বর্যশালী দেবতারাও যাঁকে প্রভু বলে সম্মান দেন, তাঁকেই কি না আমার মেয়ে পছন্দ করেছে, ধন্যি মেয়ে আমার। আমাদের বংশের মর্যাদা রেখেছে। এঁদের থেকেও ভালো, তাহলে কেমন হবে তিনি—কীদৃক্ সো'য়ং ভবিষ্যতি?

আশ্চর্যের বাকি ছিল আরও। বাকি, কেননা ঋষিদের সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা, গরুড়বাহনে আসা অপ্রমেয় পরাক্রম পীতাম্বর বিষ্ণু মেনকার বিভ্রম আরও বাড়িয়ে দিলেন। নারদ বললেন—এঁদেরও ওপরে আছেন শিব, তিনি বর্ণনাতীত তত্ত্ব। ব্রহ্মা, বিষ্ণুর পর ভৃগু, বৃহস্পতির মতো মহাজ্ঞানী ঋষিরা এলেন এবং তারপর প্রবেশ করলেন শিব। শিবের আগে ভূত, প্রেত, পিশাচ, প্রমথ দল ঢুকল। নারদ আওয়াজ তুললেন—হ্যাঁ, এইবার আসছেন তিনি, আসছেন রুদ্র-শিব—তাবদ্ রুদ্রো সমায়াতো নারদস্তামুবাচ হ। এদিকে ভূত, প্রেত, পিশাচের কদাকার বিকৃত মুখ, কারও রোমশ দেহ, কেউ গালাগাল দিয়ে কুকথা বলছে, কেউ ডমরু বাজাচ্ছে, কেউ শিঙা ফুঁকছে, কেউ গাল বাজাচ্ছে—মেনকা তো ভয় পেয়ে তাকাচ্ছেন চারদিকে। কোথায় সেই প্রধানতম রুদ্র-শিব। নারদ বললেন—ওই যে আসছেন তিনি—তন্মধ্যে শঙ্করং দেবং নির্গুণং গুণবত্তরম্।

মেনকা দেখলেন—ষাঁড়ের ওপর বসে আছেন শিব, সেই ষণ্ডপৃষ্ঠের ওপরে বসা শিবের পরিধানে বায়ুবেগে কম্পমান এক গজচর্মের আস্তরণ। নারদ মুনি সেই দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে মেনকা মাকে বললেন—এই হচ্ছেন রুদ্রশিব। মুহূর্তে সমস্ত কল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। হিমাদ্রিপত্নী মেনকা ভেঙে পড়লেন কান্নায়। আরম্ভ হল সেই বিলাপিনী ভাষা, যা আমরা ব্যবহার করে থাকি। ঘরের মেয়ে বেজায়গায় প্রেম করলে বাপ-মা যেমন মেয়েকে গালাগালি দিতে থাকেন, মেনকাও ঠিক সেইভাবে গালাগালি দিতে থাকলেন পার্বতীকে। এই বিবাহের ঘটক নারদকেও তিনি ছাড়লেন না এবং নিজেও ভীষণ হতাশ বোধ করতে লাগলেন। মেনকা বললেন—ওরে অসভ্য মেয়ে! এ তুই কী করলি, তোকেও শত ধিক্, আমাকেও ধিক্—আমি তোকে পেটে ধরেছি—কিমিদঞ্চ কৃতং দুষ্টে ধিক্ ত্বাং মাঞ্চ দুরাগ্রহে।

মেনকা নারদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমিই না আগে এসে মেয়ের বাপের কাছে বলেছিলে যে, আমার মেয়েকে বিবাহ করবে স্বয়ং শিব-মহাদেব। হিমালয়ও সেই তোমার কথা শুনে মেয়েকে শিবের পরিচর্যায় অভিমুখী করেন। তারপর তো কত কিছু হল। মেয়ে আমার কঠিন তপস্যা করতে গেল এই শিবকে স্বামী হিসেবে পাবার জন্য। আজ তার কী ফল হল দ্যাখো। এখন আমি কী করি, কোথায় যাই! কারও কোনও ক্ষতি হয়নি, এতে শুধু আমার ঘরটা গেল, আর কারও কোনও ক্ষতি হয়নি, শুধু আমার ঘরটাই শেষ হয়ে গেল—কস্যাপি কিং গতং নৈব মমাপি চ হতং গৃহম্। আমি কতই না আশা করে মেয়ের বর দেখতে এলুম হাতে প্রদীপ নিয়ে, সেই প্রদীপ সহ আমি পড়ে গেলাম কুয়োয়।

মেনকা ভীষণই রেগে গেছেন। বললেন—এ ঘটনায় যারা সব সালিশি করেছিল, সেই সপ্তর্ষিরা এসে হিমালয়ের কাছে কত গুণপনা ভালোভালাই করে বলে গেল, সেই সপ্তর্ষিরা কোথায় এখন, ওদের দাড়ি-গোঁফ টেনে ছিড়ব আমি—ক্ব গতা ঋষয়ো দিব্যাঃ শ্মশ্রূণ্যুত্রোটয়াম্যহম্। সেই বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীই বা কোথায়? তিনি অনেক ভালো ভালো কথা বলেছিলেন এই শিবের সম্বন্ধে। অবশ্য এঁদের দোষ দিয়ে লাভ কী। আমার সর্ব অনর্থের মূল হল আমার এই মেয়েটা। সেই তো সব অনর্থ ঘটিয়েছে—সর্বং পুত্র্যা কৃতং স্বয়ম্।

পুরাণের মধ্যে মেয়ের মার এই স্বগত বিলাপ আমার কাছে অন্যতর এক মধুর মাত্রা এনে দেয়। গাঁয়ে-গঞ্জে তো বটেই অতিশয় ভদ্রঘরেও এই বিলাপ যেন আমরা অনেক শুনেছি। অনেক বড় মানুষ অভিজাত মহিলার মধ্যেও এই মুহূর্তে এক ধরনের অসূয়া কাজ করে। অর্থাৎ কিনা অন্যের ঘরে এরকমটা হয়নি শুধু আমার ঘরে হয়েছে বলে অন্য অসংবদ্ধ আত্মীয়স্বজনের ওপরে তারা ভালো আছে বলেই যেন রাগ হয়। মেনা বলেছেন—এই অসভ্য মেয়েটা অন্য সমস্ত ভালো ভালো ঐশ্বর্যশালী দেবতাকে সযত্নে পরিত্যাগ করে এই মরার জন্য তপস্যা করে কাকে ডেকে আনল ঘরে—সর্বান্ দেববরাংস্ত্যক্ত্বা শিবার্থং তপ ঈদৃশম্! সবাইকে ফেলে এই শিব! আমার মেয়ে সোনা ফেলে কাচ কুড়িয়ে নিয়েছে আঁচলে, চন্দন ফেলে গায়ে কাদা মেখেছে— হিত্বা তু চন্দনং সদ্যো লেপিতঃ কর্দমস্তয়া।

উত্তম বস্তু পরিত্যাগ করে বর্জ্য বস্তু সাদরে গ্রহণ করার মধ্যে যে ভয়ানক বোকামি আছে, সেই বোকামি যে কতটা সেটা বোঝানোর জন্য জননী মেনকার মুখে ইচ্ছামতো উপমা জুগিয়েছেন। মেনকা বলেছেন—ওরে! তুই রাজহাঁসটা উড়িয়ে দিয়ে একটা কাক ধরে এনেছিস হাতের মুঠোয়—হংসমুড্ডীয় কাকো'য়ং গৃহীতো হস্তপঞ্জরে। গঙ্গাজল ফেলে কুয়োর জল খেতে লেগেছিস তুই, সূর্যের আলো ছেড়ে জোনাক পোকার

boierpathshala.blogspot.com

আলো তোর ভালো লাগছে, তুই ঘি ছেড়ে রেড়ির তেল খাওয়া আরম্ভ করেছিস—ঘৃতং ত্যজ্য তথা তৈলম্ ঐরণ্ডং ভোজিতঃ স্বয়ম্। একটার পর একটা উত্তম অধমের উপমা দিয়ে মেয়েকে তিরস্কার করার পর মেনা নিজেই নিজেকে গালাগালি দিতে লাগলেন হতাশায়। বললেন—এমন সন্তান হওয়ার চেয়ে আমি বন্ধ্যা হলেও ভালো হত। ভালো হত গর্ভাবস্থায় আমার গর্ভ নষ্ট হয়ে গেলে—বন্ধ্যাহং ন কথং জাতা গর্ভো ন গলিতঃ কথম্? আর জন্মালই যদি মেয়েটা, তাহলে জন্মের পর তো মরতেই পারত। এ-সব কিছুই যখন হয়নি, তখন আমি নিজেই শেষ করব এই মেয়েকে, না হয় আমি নিজে মরব।

মেনকার উদ্‌গত ক্রোধ এবং দুঃখ, সবটাই কিন্তু মহাদেবের চেহারা, বৈরাগ্য, বৃষবাহন, ফণিভূষণ—এ-সবকেই কেন্দ্র করে। মেনকাকে কেউ বোঝাতেও পারছেন না। নারদমুনি তো শঙ্কিত হয়ে আছেন, সপ্তর্ষিরা ভীত, ফলে আসরে নামলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। তিনি শিবের প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাতে আরম্ভ করলেন মেনকাকে। কিন্তু ব্রহ্মার কথা চলার মধ্যেই পার্বতী নিজে এসে শিবের মর্যাদা বোঝাতে চেষ্টা করলে মেনকা আরও একবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এই অবস্থায় নারদমুনি এবং অন্যান্যেরা পার্বতীকে মেনার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন—তদ্‌হস্তাৎ তাং পরিচ্ছিদ্য নীত্বা দূরতরং স্থিতাঃ। মেনকা সেই অবস্থায় আবারও চেঁচাতে লাগলেন। বললেন, দেখুন, সবাই দেখুন, আমার এই অসভ্য মেয়েটা কেমন বর পেয়েছে দেখুন। একটা লোক বিয়ে করতে এসেছে, তার বাপ-ভাই কেউ নেই, মা, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। না আছে রূপ, না আছে বুদ্ধি, না আছে টাকা, বাড়ি-ঘর কিচ্ছু নেই। বাহনটা পর্যন্ত ঠিকঠাক নয়—বাহনং ন শুভশ্চাস্য ন বয়ো ন ধনং তথা।

বিষ্ণু ভগবান দেখলেন—ঘটনা খুব খারাপ দিকে চলে যাচ্ছে। তিনি এবার মেনকাকে শিবের এই বিচিত্র বেশ এবং বিচিত্র ব্যবহারের তত্ত্ব সভাষ্যে বোঝালেন পরম গম্ভীরতায় —এমন সেই গম্ভীরতা যেখানে উচ্চভাষে কথা বলা চলে না, পছন্দ না হলেও তর্কযুক্তির দার্শনিক গভীরতায় চুপ করে থাকতে হয়। এই ঘটনার পাশাপাশি নারদমুনির প্ররোচনায় শিব-মহাদেব তাঁর জটিল বিবাগী মূর্তি পরিহার করে অপূর্বদর্শন এক চেহারা নিয়ে দাঁড়ালেন মেনকার সামনে। মেনকা মোহিত হয়ে গেলেন একেবারে। কোটি সূর্যের মতো দেদীপ্যমান তাঁর গায়ের রং, মস্তকে মুকুট, বিচিত্র বসন, মুখে মৃদু হাসি। মেনকা জননীর জন্য চমৎকার তৈরি হল। এতক্ষণ তিনি যে মুখে নিন্দা করছিলেন, সেই মুখ এবার ভরে উঠল প্রশংসায়। খুব লজ্জা হচ্ছিল তাঁর কথা বলতে, তবুও অনেক সোচ্ছ্বাস উক্তির মধ্যে তাঁর এই কথাটা ছিল যে, ধন্যি মেয়ে বটে আমার, এমন একটা পুরুষকেও আমার মেয়ে বশ করতে পেরেছে—ধন্যা পুত্রী মদীয়া চ যথাসৌ পরবান্ কৃতঃ। শিব যে এমন মোহন বেশে ধরা দিলেন, এই রূপকে আমরা তেমন অপ্রাকৃত মনে করি না। তিনি যদি এমনিতেই অসামান্য সুন্দর না হতেন, তবে তাঁর নটরাজমূর্তি তৈরি হত না। অতএব তিনি সুন্দরই বটে, তবে ওই তাঁর অভ্যাস, তিনি নিজেকে এমনভাবেই প্রকট করেন, যাতে ভারতবর্ষের সাধারণ্যে তাঁর প্রতীতি সহজ হয়ে ওঠে।

শিবের বিবাহ যেমন করে পুরাণের মধ্যে বর্ণনা করা আছে—সে একেবারে মন্ত্রোচ্চারণ করে বিয়ে থেকে অনন্ত স্ত্রী আচারের মধ্যে নিজেকে প্রায় অসহায় করে তোলা, সে সবই বর্ণিত হয়েছে পুরাণে। কিন্তু তারকাসুর-বধের জন্য যেভাবে উমা-মহেশ্বরের মিলন দেবতাদের সভায় কল্পিত হয়েছিল, সেইভাবেই তাঁদের মিলন সংঘটিত হল না কিন্তু। হ্যাঁ, আমাদের শাস্ত্রকাব্যের অনেক জায়গাতেই শিব-পার্বতীর গাঢ় মিলনের বর্ণনা আছে এবং সে বর্ণনা এমন মাত্রায় গেছে যে, মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত সযত্নে পরিহার করেছেন এই মিলন-প্রক্রিয়া, কেননা সেটা নাকি জনক-জননীর সম্ভোগ বর্ণনার মতো নির্লজ্জ শুনতে লাগবে, অতএব। আমরা তাই শিব-সম্ভোগের সেই আত্যন্তিক বর্ণনা দিয়ে স্কন্দ-কার্তিকেয়র মতো দেবতার কুমারসম্ভব ঘটাতে চাই না। তবে এ বিষয়ে তথ্য নিবেদন না করলেও শিব-জীবনের একটা অংশ বাকি থেকে যাবে।

একটি পুরাণ অনুযায়ী তারকাসুর বিজয়ী পুত্রলাভের জন্য শিব নাকি বিবাহের পরেই পার্বতীর সঙ্গে মহাসুরতে আসক্ত হলেন। সাধারণ মৈথুনকে যদি সুরত-কর্ম বলা হয়, তবে শিবমৈথুন একেবারে 'মহাসুরত'। তাতে মনুষ্য-পরিমাণে বত্রিশটা বছর নাকি এক মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল। ধরা কম্পিত হল। দেবরাজ ইন্দ্র শঙ্কিত হলেন এই ভেবে যে, তাঁর থেকেও শক্তিমান শিব-পুত্র জন্মালে তাঁর কর্তৃত্ব নষ্ট হবে। তিনি এবার ব্রহ্মার কাছে দুঃখ নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা সব দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং শিবের কাছে গিয়েই অনুরোধ করলেন যাতে উমার গর্ভে কোনও পুত্রই না জন্মায়। দেবতারা প্রার্থনা করলেন—শক্তিমত্তম যে-পুত্রের জন্য শিব মহাসুরতে মত্ত হয়েছেন পার্বতীর সঙ্গে, সেই মৈথুনই যেন তিনি পরিত্যাগ করেন।

স্বর্গের দেবতাদের এই বড় জ্বালা। বিশেষত এই দেবরাজ ইন্দ্র, সব সময়েই তাঁর নিজের শক্তি আর স্বর্গ-সিংহাসন নিয়ে এত চিন্তায় থাকেন যে, একেক সময় তাঁকে একেক রকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই তো ঠিক ছিল যে, শিব-তেজে উৎপন্ন মহাবীর পুত্রকে তারক-বধ করানো হবে এবং তার জন্যই পার্বতীকে নিয়ে এত কাণ্ড। আবার এখন বলছেন – হ্যাঁ, শিবের ছেলে চাই বটে, কিন্তু সেটা পার্বতীর গর্ভে নয়। শিব শুনলেন এবং শরণাগতের প্রতি কৃপাবশত তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই মহামৈথুন থেকে বিরত হলেন। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল তাঁর মৈথুনগত তেজ ধারণ করার ব্যাপারে। দেবতারা অগ্নিকে অনুরোধ করলেন শিববীর্য ধারণ করতে। মহাদেব প্রজ্বলিত অগ্নিতেই তাঁর শক্তিবীর্য নিক্ষেপ করলেন বটে, কিন্তু সেই সময় দুটি বিন্দু পতিত ভ্রষ্ট হয়ে পড়ল পর্বতে। সেই বিন্দু থেকে জন্মালেন শিবের দুই গণাধীশ পুত্র—একজন ভৃঙ্গ বা ভ্রমরের মতো কালো, তাই ব্রহ্মা তাঁর নাম রাখলেন ভৃঙ্গী, আর একজন ঘোরতম কৃষ্ণবর্ণ, তাঁর নাম রাখলেন মহাকাল। এঁরা দুজনেই কিন্তু এক অর্থে শিবের পুত্র এবং শিব তাঁদের নিযুক্ত করেছেন আপন গৃহের দ্বারপালের কাজ করার জন্য। তাঁরা নির্দিষ্ট এক-একটি শিবগণের অধীশ্বর। এক অর্থে তাঁরাও শিব।

যাই হোক, যে প্রসঙ্গে ছিলাম। প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে স্খলিত হল মহাবীর্য। আমরা অবশ্য রূপকাশ্রয়ী দৃষ্টিতে এই শিবশক্তি মহাবীর্যের সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নির পার্থক্য বুঝি না। প্রজ্বলিত অবস্থায় এই দুটিই পুরুষ-শরীরে ধারণের অযোগ্য। হয়তো বা এই কারণেই শিব বলেছিলেন—যোগমায়া এবং আকাশগঙ্গা ছাড়া তাঁর শক্তি কেউ ধারণ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে পূর্বাহ্ণেই যোগমায়া পার্বতী দেবতাদের কৌশলে নিরাকৃতা। শিব তাই বুদ্ধি দিলেন—পর্বতরাজ হিমালয়ের বড় মেয়ে হলেন আকাশগঙ্গা মন্দাকিনী, তিনি উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁরই গর্ভে জন্মাবেন দেবতাদের সেনাপতি। শিবের নির্দেশমতো আকাশগঙ্গায় শিবতেজ নিক্ষেপ করলেন অগ্নি। গঙ্গা তাঁর শীতল জলগর্ভে ধারণ করলেন শিবের স্খলিত 'স্কন্ন' বীর্য। সেই

boierpathshala.blogspot.com

'স্কন্ন' বীর্য থেকেই গঙ্গাগর্ভজাত শিবের পুত্রের নাম স্কন্দ। গঙ্গা অবশ্য তাঁকে কোলে রাখতে পারেননি। তিনি এই সন্তানকে ত্যাগ করেছিলেন শরবনে অর্থাৎ নলখাগড়ার বনে। অন্য পুরাণগুলির মতে গঙ্গাও সেই অগ্নিসন্নিভ শিববীর্য ধারণ করতে না পেরে শরবনে গর্ভমোচন করলেন। সেখানে জন্মালেন স্কন্দ। তার ছয় মুখ, কিন্তু জঠর একখানি। দেবতাদের নির্দেশে ছয় কৃত্তিকা মা এসে নবজাতকের ছয় মুখে স্তন্যপান করালেন। কৃত্তিকা-মায়ের নামে তাঁর নামও হল কার্তিক।

কী ভয়ংকর জটিল যে এ-সব জায়গা এবং পার্বতীর গর্ভজাত নয়, অথচ এই স্কন্দ-কার্তিকেয় শিবেরও ছেলে, পার্বতীরও ছেলে, অগ্নিরও ছেলে, কৃত্তিকাদেরও ছেলে আবার একভাবে গঙ্গারও ছেলে। পণ্ডিতেরা বলেছেন—এতে সমস্যার কিছু নেই। শিবের মতো মহাদেবতা, তাঁর কত রূপ, কত তাত্ত্বিকতা। এই যে শিবশক্তি শিববীর্যের এত ঘুরপাক—যার মধ্যে অগ্নির মতো পুরুষও আছেন, আবার গঙ্গার মতো মেয়েও আছেন, এগুলো আসলে এক বৃহৎ তত্ত্বের আভাসিক পরিণতি। মহাভারত স্কন্দ-কার্তিকেয়র জন্মের মধ্যে অগ্নির অনুপ্রবেশ নিয়ে কোনও দুর্ভাবনাই করেনি। বরঞ্চ সোজাসুজি বলেছে— রুদ্র আসলে অগ্নিই বটে, অতএব অগ্নির তেজ বা অগ্নির ছেলে মানে রুদ্রেরই ছেলে—রুদ্রমগ্নিং দ্বিজা প্রাহুঃ। অনুপ্রবিশ্য রুদ্রেণ বহ্নিং জাতো হ্যয়ং শিশুঃ। আবার ওদিকে উমা পার্বতী, কৃত্তিকা, গঙ্গা এগুলি সবই এক অভিন্না প্রকৃতি বা আদি-শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর। শক্তিমান শিবের সঙ্গে শক্তির মিলনটাই এখানে সবচেয়ে বড় কথা।

॥ চার ॥

আমরা কিন্তু দেখুন সব পৌরাণিক কথক ঠাকুরের কথকতার শ্রোতা, আমরা ওসব দ্বয়াদ্বয় তত্ত্ব নিয়েও মাথা ঘামাই না, সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব শিব-পার্বতীর ওপর চাপিয়ে দিলেও আমাদের মাথা ধরে যায়। আর এটাও তো ঠিক পুরাণে-ইতিহাসে শিব-কাহিনির অন্ত নেই, তার সব কটি নিয়ে আমরা যদি দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহলে সেই বিরাট পুরুষের লীলাবিলাস আমাদের কাছে অধরা থেকে যাবে। কেননা শিবের তত্ত্বের মধ্যে ব্রহ্মভাবনা আবিষ্কার করতে গিয়ে একবার যদি 'তিনিই আমি' এবং 'আমিই তিনি' বলে ভাবতে থাকি, তাহলে তো এক সময় ত্যাগ-বৈরাগ্য আর তিতিক্ষায় আমিই শিবস্বরূপ হয়ে পড়ব, সে কিন্তু আমার মতো ভক্তিমানী মানুষের পক্ষে চরম দুর্ভোগ। আর এ-রকম যে আমাদের দেশে হয়নি, তা তো নয়। ওই যে আমাদের শংকরাচার্য, যাঁকে লোকে ভগবান শিবের অবতার বলে মানে, সেই অবতার-প্রমাণ মানুষটি কী করলেন? বললেন— জগতের সব কিছু মিথ্যে, যা দেখছ তা সত্য নয়, আভাসিক, সত্যের আভাস, সত্যের আরোপণ। আর ব্রহ্মের বিরাটত্ব যদি হৃদয়ে অবধারণ করতে না পারো, তবে শিবের মতো এক সাকার মূর্তির ওপর মনঃস্থির করে ভাবতে থাকো —আমার পুণ্যও নেই, আমার পাপও নেই, সুখও নেই, দুঃখও নেই, আমার মা-বাপও নেই, বন্ধু-বান্ধবও নেই, আমি ভোজনও নই, ভোজ্যও নই, ভোক্তাও নই, আমি হচ্ছি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বয়ং শিবই— চিদানন্দরূপঃ শিবো 'হং শিবো'হম্।

ভোজ্য-ভোজন-ভোক্তাও যেখানে একাকার হয়ে যাচ্ছেন, সেখানে আমাদের প্রেমভক্তির ভাবুক পুরুষেরা ওই জায়গাটা ধরেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন— ভোজ্য-ভোজনের জায়গা থেকেই কথা আরম্ভ হোক। ভগবান আমাদের কাছেও চিৎস্বরূপই বটে, আবার আনন্দস্বরূপও বটে। আনন্দ কিংবা রসস্বরূপ হলেই তো সেখানে আস্বাদনের প্রশ্ন আসে। আর আস্বাদন যদি করতে হয় তবে একাকার হলে চলে না, সেখানে ভোজ্যও লাগে, ভোক্তাও লাগে। ভোক্তা যদি ভোজ্য হয়ে যায়, আমিই যদি শিব হয়ে যাই— এমন নিরাকার মুক্তিতে রসের আস্বাদন হয় না। অতএব শংকরাচার্য যেখানে বলবেন— আমি ভোজ্য, ভোজন, ভোক্তা কোনওটাই নই, আমি শিব, আমি তিনি, তখন আমাদের বঙ্গদেশের রামপ্রসাদ ফুট্ কেটে বলবেন— সে কেমন কথা জানো— (এমন) নির্বাণে কী আছে ফল/ জলেতে মিলায় জল, / চিনি হওয়া ভাল নয় মন/ চিনি খেতে ভালোবাসি। আমি যদি নিজেই চিনি হয়ে যাই, তাহলে চিনির আস্বাদন হবে কী করে। আমরাও তাই বলছিলাম— পুরুষ-প্রকৃতি, শক্তিমান-শক্তি, সূর্যের স্বরূপ রুদ্র আর আর কিরণরূপিণী মহামায়া, কিংবা অগ্নি আর তাঁর দাহিকা শক্তি— এত সব তত্ত্ববিচারে শিব-মহাদেবের অদ্বয় ব্রহ্মবাদ স্থাপন না করে আমরা ভক্তিভরে তাঁর লীলা-বিলাস আস্বাদন করতে চাই।

আপনারা ভাবছেন— বাংলার কবি রামপ্রসাদ সেন। এ-দেশের মাটি, জল, আর-বৃক্ষ-লতার মন্দ হাওয়ায় দেবতার জন্য তাঁর এমন মাখো-মাখো ভাব তৈরি হয়েছে। এবার তাই এক মহাকবির কথা বলি। একাদশ-দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে লেখা বিখ্যাত অলংকারশাস্ত্র কাব্যপ্রকাশের মধ্যে এক শিবভক্তের বক্তব্য ধরা আছে। সেখানে প্রস্তাবনাটুকু এই যে, এই শিবভক্তের ভক্তিতে খুশি হয়ে পরম শিব তাঁকে নির্বাণ-মুক্তি দিয়েছেন। সে মুক্তি আবার সাযুজ্য মুক্তি— অর্থাৎ তাঁকে তিনি শিব সাযুজ্যে শিব হয়ে যাবার বর দিয়েছেন। এই অবস্থায় সেই চরম মুহূর্ত এসেছে যখন সেই মুক্তির কিনারায় দাঁড়িয়ে এই শিবভক্ত তাঁর হা-হুতাশ জানাচ্ছেন এই মুক্তি নিয়ে। তিনি মুক্তি চান না, আজীবন তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতার সেবা রস আস্বাদন করতে চান। ভক্ত বলছেন— আমার গায়ে নিত্য আমি ভস্ম-বিভূতি মেখে বৈরাগ্যের সাধন করতাম— তো ভস্ম! আজ চিরকালের মতো বিদায় জানাচ্ছি তোমাকে, কেননা আজকে আমি শিব হয়ে গেলে ভস্ম মাখার মূল্য কী। হায় রুদ্রাক্ষমালা। কতবার হাতে গলায় রুদ্রাক্ষ পরে শিব-শিব বলে নেচেছি, কতবার 'নমঃ শিবায়' বলে জপ করেছি এই রুদ্রাক্ষের মালা, আর তোমাকে দরকার হবে না, ভালো থাকো তুমি— ভস্মোদ্ধূলন ভদ্রমস্তু ভবতে রুদ্রাক্ষমালে শুভম্।

আসলে এই ভস্ম রুদ্রাক্ষের আসঙ্গ-বোধ আপনারা বুঝতে পারবেন না। আমি এক কোমরভাঙা বুড়িমাকে তুলসীপাতা সহ তুলসী-মঞ্জরির মালা গাঁথতে দেখতাম প্রতিদিন। কৃষ্ণ আর রাধারানির গলার দুলিয়ে দেবেন বলে, সেই মাল্যসেবার যে নিপুণতা আমি দেখেছি, যে সময় ধরে তিনি এক-একটি মালা গেঁথে তুলতেন, তার মধ্যে কৃষ্ণ-ভগবানকে শৃঙ্গারী করে তোলার রস-ভাব যদি না থাকত, যদি না সেই আস্বাদন থাকত যে, আমারই গাঁথা মালা পরে আজ শ্যাম অভিসারে যাবেন বিনোদিনী রাধা, তাহলে তাঁর বয়স এবং অসুস্থতা নিবন্ধন সেই মালা তাঁর পক্ষে গাঁথা সম্ভব হত না। এখানে এই শিবভক্তের তৃতীয় পঙ্‌ক্তির উচ্চারণ আমাকে পাগল করে দেয়। সে বলছে— হা সোপান-পরম্পরা, এই সেই শিবমন্দিরের সিঁড়িগুলো, যা প্রতিদিন আমি ধুয়ে মুছে মার্জনা করে রাখতাম। কত দূর-দুরান্ত থেকে ভক্তেরা আসবেন, আর এই একটা-একটা সিঁড়ি তাকে নিয়ে যাবে গিরিসুতা পার্বতীর প্রাণনাথ শিব-শংকর-মহাদেবের কাছে। আমার যে কী ভালো লাগত' আমারই পরিষ্কৃত সোপান মার্গের এক-একটি সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি বেয়ে ভক্তেরা আমারই উপাসিত বিগ্রহ শিব-পার্বতীকে দেখে আসছেন, আমার যে কী ভালো লাগত' কিন্তু আর দরকার হবে

boierpathshala.blogspot.com

না, আমার আজ শিবত্ব লাভ ঘটেছে, তাই শিবমন্দিরে সোপান-মার্জনার আস্বাদন কোথা থেকে পাব আমি— হা সোপান-পরম্পরা গিরিসুতা-কান্তালয়ালংকৃতিম্!

আসলে শিবভক্তের এই যে আক্ষেপ, এই যে আকুতি, এর মধ্যেই পরম-শিবের লীলাভূমি গড়ে ওঠে। কেননা সেখানে তিনি রসিক-ভাবুকের আস্বাদন গুণে একান্ত মানুষ হয়ে ওঠেন। আর সেই মানুষ-শিবকেও আমরা কীভাবে দেখেছি। একবার তাঁকে আমরা পরম বৈরাগী যোগী হিসেবে দেখেছি, কখনও বা দেখেছি চরম কামুক হিসেবেও। পণ্ডিতরা অবশ্য বলেছেন— এই যোগীতম পুরুষের যোগ চরমভাব এবং কামুকত্বের চরম ভাব, এই দুটো কিন্তু সাদা-কালো, গরম-ঠান্ডা— এইরকম বিপরীত। বরঞ্চ এই যোগ এবং এই কামনার একটা সাধারণ ভাব আছে— সেটা হল আগুনের মতো এক চরম তাপ— তপস্যার আগুন বা যোগাগ্নি ধ্বংসও করে সৃষ্টিও করে, আবার কামনার আগুনও হয় ধ্বংস করে, আবার সৃষ্টিও করে। শিবের ঐশ্বরিক ক্ষমতা এটাই যে শিব তাঁর যোগের ক্ষমতাও নিয়ন্ত্রণ করে হঠাৎ কামনার জগতে ফিরতে পারেন, আবার কামনার চরম সময়েও তিনি কামবেগ নিরুদ্ধ করে যোগাসনে বসতে পারেন।

এটা তো সত্যি, দেবতাদের প্রয়োজনে, অশুভ শক্তি দমনের প্রয়োজনে তিনি যোগ-সমাধি ত্যাগ করে কামনার জগতে এসে বিবাহ করেন। তপস্বিনী পার্বতীকে তিনি নিজেই বলেছিলেন— তিনি তো একাকী এবং বিষয়ভোগের ক্ষেত্রে সর্বদাই বিরাগী— একাকী চ সদা নিত্যং বিরাগী চ বিশেষতঃ। আবার সেই শিবই কিন্তু নিতান্ত জাগতিক প্রয়োজনে যখন বিবাহ করছেন তখন তাঁর মহামৈথুন থামানো যায় না। কিন্তু সেই মৈথুনও তিনি দেবতাদের অনুরোধে এক মুহূর্তে স্তব্ধ করে দেন। আসলে এই অদ্ভুত ঐশ্বরিক ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাই তাঁর বৈপরীত্যগুলিকে যেমন তাৎপর্যময় করে তোলে, তেমনই তাঁর চরম যোগী-সত্তা এবং কামুক-সত্তার মধ্যেও সমাধান সেতু রচনা করে দেয়। একটি পুরাণে শিব বলেছেন, তিনি যদি বিবাহ করেন তাহলে তিনি যখন যোগীর আবেশে যোগ সমাধিতে থাকবেন, তখন তাঁর স্ত্রীকে যোগিনী হতে হবে, আবার তিনি যখন কামী হয়ে উঠবেন, তখন তাঁর স্ত্রীকে হতে হবে কামিনী, মোহিনী—

যোগযুক্তে ময়ি যথা যোগিন্যেব ভবিষ্যতি।
কামাসক্তে ময়ি পুন-র্মোহিন্যেব ভবিষ্যতি।।

শিবভাবনার এই পরিসরের মধ্যে হয়তো পৌরুষেয় আতিশয্য কিছু আছে। মনে হবে যেন পুরুষের ইচ্ছানুযায়ীই প্রকৃতি তাঁর আদেশ মান্য করছে যখন তখন। কিন্তু শিবের কথাটা নিছক বাণী দেবার মতোই লাগে। কেননা সাংখ্যদর্শনের তাত্ত্বিকতাতেও সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় পুরুষের কোনও ভূমিকা নেই। তিনি চৈতন্যস্বরূপ বটে কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয়, অথচ প্রকৃতির চৈতন্য নেই। তিনি জড়রূপা, কিন্তু তাঁর কর্মক্ষমতা আছে, ক্রিয়াকারিতা আছে। আমরা যে শিব-পার্বতীর বিবাহ দেখলাম, এর মধ্যেও এই তাত্ত্বিকতা, শিবের যোগশক্তি এবং কামাশক্তির মধ্যেও সেই দার্শনিক তাত্ত্বিকতা। গীতার যে বিখ্যাত শ্লোকটি— কার্যকারণ-কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে— সেখান থেকে বোঝা যাবে— প্রকৃতি জড় বলে তিনি স্বয়ং সৃষ্টিকার্যের কর্ত্রী হতে পারেন না আবার চেতন নিষ্ক্রিয়, তাঁর কোনও ইচ্ছেটিচ্ছে নেই (ভোলা মহাদেব), ফলে তাঁর পক্ষেও সৃষ্টিকার্যের সূত্রপাত ঘটানো সম্ভব নয়। তাহলে এই সৃষ্টি হবে কী করে? গীতার ব্যাখ্যা বলেছে— সাক্ষী চৈতন্যরূপী নিষ্ক্রিয় পুরুষ প্রকৃতির কাছাকাছি সন্নিধানে এলেই প্রকৃতির কাজ দেহ ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি তৈরি হতে থাকে। ওই যে আগে দেখেছি— সমাধিরত শিব-পার্বতীর মাথায় হাত রেখে অন্য আশীর্বাদ করলেও পার্বতীর শরীর ফুটে ওঠে বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলটির মতো। দর্শন বলবে প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করেন, পুরুষ কেবল সুখ-দুঃখের ভোক্তামাত্র। মহাদেব-শিব যে বললেন— যখন আমি যোগীভাবে থাকব তখন আমার স্ত্রী হবেন যোগিনী— এর মানে এই যে, প্রলয়ের পর প্রকৃতি নিস্তরঙ্গ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন তিনি যোগিনীর মতোই শান্ত। কিন্তু সৃষ্টির প্রয়োজন যখন হয়, যখন কমলকলির মতো অনভিব্যক্তা পৃথিবীর অভিব্যক্তিস্থানে অসঙ্গ শিব-পুরুষের চৈতন্য-দৃষ্টিপাত ঘটে, তখন সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রকৃতি তখন কামিনী হয়ে ওঠেন কেন না অসঙ্গ শিবপুরুষও তখন সৃষ্টির তপস্যায় কামুকতায় লিপ্ত হন, অন্তত তাঁকে কামুকের মতো দেখতে লাগে।

ঠিক এইরকম একটা দার্শনিকতা পিছনে রেখেই কিন্তু সেই পরম শিবের বহুতর কামুকতার কাহিনি তৈরি হয়েছে, আমরা সেগুলিকে লীলার বুদ্ধিতে উপভোগ করি এবং ভ্রান্ত বোধ করি তার বিচিত্রতায় এবং বৈপরীত্যে। সে বৈপরীত্য এমনই যে, যোগীশ্বর নামে এক কবি শিবের অনুচর ভৃঙ্গীর সম্বন্ধে লিখেছেন— ভৃঙ্গী নাকি তাঁর নিজ প্রভু শিবের বিপরীত সব আচরণ দেখে ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর মাথায় বার বার করে ঘুরছে এই প্রহেলিকা যে, কেমন আমার এই প্রভু শিব? তিনি দিগম্বর, মানে তাঁর পরনের কাপড় থাকে না অবহেলায়, অথচ তাঁর হাতে আছে ভয়ংকর পিনাক ধনু। আবার হাতে যদি এত ভয়ংকর অস্ত্রটাই থাকে তাহলে গায়ে ভস্ম মেখে এমন অরুণকান্তি যোগী ভিখারি সাজার কী প্রয়োজন! আর ভিখারিই যদি সাজলে তাহলে আবার স্ত্রীলোক নিয়ে এত রঙ্গ কীসের? আবার স্ত্রীসঙ্গ যদি তোমার প্রয়োজনই হয়, তাহলে বেচারা কামনার দেবতার সঙ্গে তোমার এত বৈরিতা কীসের— ভস্মাঙ্গস্য কিমঙ্গনা যদি চ সা কামং পরিদ্বেষ্টি কিম্?

আমরা শুষ্ক তত্ত্ব ছেড়ে এবার বাস্তব শিব জীবনে আসি। কেননা তাঁর কামনার জায়গা আছে ভূরি ভূরি, কিন্তু সেগুলি শেষ পর্যন্ত এমন এক হাস্যরসে পর্যবসিত হয়, যাতে কামনা বস্তুটাও শিবের পক্ষে এক লঘু প্রতীক হয়ে ওঠে। সেই যে অমৃতমন্থনের সময় অমৃত উঠে এল, তখন দেবতা এবং অসুরদের সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত করে ভগবান বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করেছিলেন। সে রূপ দেখে অসুরেরা এত মোহিত হল যে, তারা সুন্দরী স্ত্রী বলে তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ পর্যন্ত করল না। দেবতারা সেই ফাঁকে অমৃত খেয়ে চলে গেলেন। এই অদ্ভুত আশ্চর্য ঘটনা শিব-মহাদেবের কানে এসে পৌঁছল। শিব সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৃষবাহনে চড়ে বসলেন। সঙ্গে নিলেন দেবী পার্বতীকে। শিব বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করে প্রভূত প্রশংসা করলেন। ভাগবত পুরাণের মতো বৈষ্ণব পুরাণে শিবের মুখে বিষ্ণুর প্রশংসা স্বাভাবিক। সব প্রশংসার শেষে শিব বিষ্ণুকে বললেন— তোমার অনেক অবতার স্বরূপ আমি দেখেছি, কিন্তু এই মোহিনী রূপের বিভঙ্গ আমার দেখা হল না, আমি সেটা দেখতে চাই— সো' হং তদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি যত্তে যোষিদ্বপুর্ধৃতম্।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে শিব-শিবানী দু'জনেই দেখলেন— বিষ্ণু আর সেখানে নেই। চারদিকে চক্ষু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দু'জনেই দেখার চেষ্টা করলেন বিষ্ণুকে, কিন্তু কোথাও দেখা গেল না তাঁকে। তিনি অন্তর্হিত যেন। খানিক পরেই তাঁকে দেখা গেল। অসামান্য সেই রূপ, অপরূপ তাঁর শারীরিক বিভঙ্গ— আবর্তনোদ্বর্তন-কম্পিত-স্তন-/ প্রকৃষ্টহারোরুভরৈঃ পদে

boierpathshala.blogspot.com

পদে। মোহিনী সেই রমণী শ্লথ পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত শরীরের মধ্যে পৌরুষেয় রিরংসা অতৃপ্ত রাখার চিরায়ত আভাস দিয়ে সতত এগিয়ে যাচ্ছে সেই রমণী— বিমোহয়ন্তীং জগদাত্মমায়য়া। শিব দেখতে পেলেন সেই রমণীকে, তাঁর স্ফুট-স্মিত-কটাক্ষের মায়াজাল এমনই যে, শিব তাঁর পাশে বসে থাকা পার্বতীকেও খেয়াল করলেন না। সেই মোহিনী মূর্তির দিকে তিনি নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন এবং উমা পার্বতী খেয়াল করছেন এই অবস্থাতেও তিনি এবার নির্লজ্জ তাড়নায় চলতে আরম্ভ করলেন সেই রমণীর পিছন পিছন— ভবান্যা অপি পশ্যন্ত্যা গতহ্রীস্তৎপদং যযৌ।

মোহিনীরূপ ধারণ করেছিলেন বলেই পুরুষকে মোহিত করার জন্য এক রমণীর যতরকম স্ত্রৈণ তন্ত্র থাকে সেই সবই প্রকট করে মাঝে মাঝে তিনি শিবের দৃষ্টিপথে চলতে লাগলেন আবার মাঝে মাঝে লুকিয়ে পড়তে লাগলেন গাছের আড়ালে। ভগবান শিবের সমস্ত ইন্দ্রিয় মথিত হল, ইন্দ্রিয় তাড়নাবশে এক সময় তিনি সবেগে সেই মোহিনী রমণীকে জড়িয়ে ধরলেন— কেশবন্ধ উপানীয় বাহুভ্যাং পরিষস্বজে। মোহিনী শিবের বাহুডোরে ধরা দিয়েও যেন ধরা দিলেন। তিনি মৃদু ভাব-হাব-বিলাসে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন নিজেকে, তাঁর কেশবন্ধ বিস্রস্ত হয়ে গেল এবং অবশেষে তিনি বেরিয়ে পড়লেন শিবের বাহুডোর থেকে। তিনি যেন দৌড়তে লাগলেন বলাৎকারী পুরুষের হাত থেকে বাঁচবার জন্য, কিন্তু শিবও দৌড় আরম্ভ করলেন অমোঘ কামনায়। এর মধ্যে যতটুকু আলিঙ্গন-সাহচর্য হয়েছিল, তাতেই পথিমধ্যে তাঁর শুক্রিতেজ স্খলিত হল এবং যেখানে যেখানে সেই তেজ-বিন্দু স্খলিত হল, সেখানে সেখানেই তৈরি হয়ে গেল রৌপ্য এবং সুবর্ণময় ভূমি। শিব শেষ পর্যন্ত দৌড়তে দৌড়তে এসে পৌঁছলেন কতিপয় ঋষিদের সামনে এবং বিষ্ণুমায়ায় তাঁর যে সংবিৎ অপহৃত হয়েছিল, ফিরে এলো সেই সংবিৎ। শিব নিজেকে দেখতে পেলেন আপন স্বরূপে। ভাগবত পুরাণের কবি অবশেষে মীমাংসা করে দিলেন শিবের এই কামুকতার। বললেন— মোহিনীরূপিণী এই বিষ্ণুমায়া তো স্বয়ং ভবপত্নী ভবাণী, ফলে তাঁর পিছনে দৌড়ে শিব ভয়ংকর কিছু অপরাধ করে ফেলেননি— আত্মাংশভূতাং তাং মায়াং ভবানীং ভগবান্ ভবঃ।

তবে কিনা বিষ্ণুমায়া-স্বরূপিণী ভবানীর প্রতিই যেভাবে ভব-বাসনার কামুকতা বিশ্রান্ত হল এখানে, সেটাকে অবশেষে কামুকতা বলতেই পারলাম না, কেননা তাতে শিবের বৈবাহিক বিধির লঙ্ঘন ঘটল না কিছু। পণ্ডিতেরা তো এমনও দেখিয়েছেন যে, এই যে মোহিনী, তিনি বিষ্ণুমায়াই হোন, অথবা বিষ্ণুর মোহিনী অবতার, এই মোহিনীর সঙ্গে শিবের যোগাযোগটা এমনই যে, মোহিনী এবং শিবের আলিঙ্গন-ভাবনাটা আসলে হরি-হর-আত্মার একাত্মতার ভাবনা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এও বলেছে যে, সেই চকিত মিলনের ফলে মহাশাস্তা নামে একটি পুত্রও জন্মেছিল। এই মহাশাস্তাই কেরালাতে 'আইয়াপ্পা'-র সঙ্গে একাত্মক হয়ে গেছেন এবং আইয়াপ্পা-র অন্য নাম হরিহর-পুত্র। বিদেশি পণ্ডিতেরা অবশ্য শিব আর মোহিনীর মিলন ঘটনাকে শুধুমাত্র বিষ্ণু-শিবের তাত্ত্বিক সমানতা বলে গ্রহণ করেননি, তাঁর তো আবার অনেকে 'বিশ্বজনহিতায়' অনেক মানবিক ভাবনা ভাবেন। তাঁদের মতে— শিব-মোহিনীর মিলনের সময়ে যে-মুহূর্তে বিষ্ণু নিজমূর্তি ধারণ করলেন, সেই সময়েও যেহেতু শিবের মৈথুন-কামিতা শেষ হয়ে যায়নি, তাই হরি-হরের তাত্ত্বিক একাত্মতার বিষয়টা তাঁদের কাছে দৈব 'হোমোসেক্সুয়ালিটি'-র উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তি অবশ্য শিবের সঙ্গে আরও একভাবে জড়িত এবং সেখানেও মোহিনী শিবের উপকারিণীর ভূমিকায় আছেন। আমরা শিবের কামুকতার আখ্যান প্রকাশ করতে-করতে হঠাৎই যে আবার মোহিনীর কথায় ফিরে এলাম, তার কারণ হল— এই মোহময়ী রমণী শিবকে মোহিত করে পার্বতীর সামনে তাঁকে লজ্জাতেই ফেলেননি, তিনি শিবের সহায়িনী ভূমিকা পালন করেছেন পরম সৌহার্দে। এখানে সেই বিখ্যাত ভস্মাসুরের কাহিনিটি আসবে, কিন্তু আমার পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে, বহুকথিত ভস্মাসুরের কাহিনিটি সোজাসুজি কোনও পুরাণে নেই। আরও পরিষ্কারভাবে বলা উচিত— যদি বা পুরাণগুলিতে ভস্মাসুরের কথা থাকেও তাহলেও সেখানে অসুরের নাম ভস্মাসুর নয়, ভাগবত পুরাণে তার নাম বৃকাসুর, আর স্কন্দপুরাণে তার নাম কালপৃষ্ঠ। সম্ভবত এই বৃকাসুর এবং কালপৃষ্ঠ দানবের কাহিনি থেকেই ভস্মাসুর নামটির সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী কালে বৃকাসুর এবং কালপৃষ্ঠকে বিস্মরণে ডুবিয়ে দিয়ে লোককথায় উঠে আসে ভস্মাসুর।

ভাগবত-পুরাণের ভস্মাসুর-বৃকের কাহিনির সৃষ্টি হয়েছে শিব-মহাদেবের উদারতা প্রকট করার জন্য। তাঁর কাছে ভক্ত কিছু চাইলে বিলম্ব করাও তাঁর স্বভাব নয় এবং ভক্ত কী চাইছে, সেটা নিয়েও তিনি পূর্বাপর ভাবেন না। ভাগবতের বৃকাসুর দেবর্ষি নারদের কাছে জানতে চাইল— ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন দেবতার মধ্যে কে সবচেয়ে দ্রুত ভক্তের ওপর তুষ্ট হন। নারদ বললেন— সে হলেন আমাদের শিব-মহাদেব— তিনি অল্পগুণেও খুশি হন তাড়াতাড়ি, আবার অল্প দোষে রেগেও যান তাড়াতাড়ি— যো'ল্পগুণ দোষাভ্যাম্ আশু তুষ্যতি কুপ্যতি। নারদের উপদেশে বৃকাসুর একাগ্রচিত্তে মহাদেবের আরাধনা আরম্ভ করল। তপস্যা তীব্রতায় দ্রুত ফল পাবার জন্য সে নিজের থেকে মাংস কেটে আহুতি দিতে লাগল শিবের উদ্দেশে। এইভাবে ছয় দিন গেল, অথচ দেবতা দেখা দিলেন না। সাত দিনের দিন সে নিজের মাথা কেটে আহুতি দেবার কথা ভাবতেই ভগবান শিব এসে উপস্থিত হলেন অসুরের সামনে। পরম ঔদার্যে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— বলো কী চাই তোমার। বর চাও তুমি। তুমি যা চাইবে, তাই পাবে— তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীস্ব মে/ যথাভিকামং বিতরামি তে বরম্।

দুষ্ট অসুর চিরপ্রার্থিত অমরত্ব চাইল না, স্বর্গরাজ্যের অধিকার চাইল না, সে বলল— আমাকে তাহলে এই বর দিন যে, আমি যার মাথায় হাত রাখব সে সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হবে। এমন অদ্ভুত যাচনা শুনে শিবের মতো পরমোদার ভগবানও যেন চিন্তিত হলেন— রুদ্রো দুর্মনা ইব ভারত। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূর্বাঙ্গীকারবদ্ধ শিব বর দিয়ে দিলেন অসুরকে। বর পেয়েই দুষ্টবুদ্ধি অসুর ভাবতে লাগল— আর দেরি নয়, এই বরদাতা শিবকে মেরেই ওর স্ত্রী পার্বতীকে হরণ করবো আমি— নূনং গৌরীহরণ-লালসঃ। পার্বতীর কথা ভেবেই বৃকাসুর মহাদেবকে বলল— এই শক্তি আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। এই কথা বলে সে মহাদেবের মাথার দিকেই হাত বাড়াল। নিজের দেওয়া বরের ফল নিজেকেই যেভাবে পেতে হচ্ছে ভেবে মহাদেব শঙ্কিত হলেন। তিনি ছুটে বেড়াতে লাগলেন এদিক ওদিক। দেবতারা হতবাক, কী করণীয় বুঝতে পারছেন না। বৃকাসুর তাড়া করে বেড়াচ্ছে মহাদেবকে, ছুটে বেড়াচ্ছেন মহাদেব। অবশেষে ছুটতে ছুটতে শ্বেতদ্বীপে বৈকুণ্ঠধামে গিয়ে ভগবান বিষ্ণুকে বৃকাসুরের বিচিত্র কাহিনি সবিস্তারে জানালেন শিব।

ভাগবত পুরাণে এই কাহিনির সূত্রপাতেই একটা একটা

boierpathshala.blogspot.com

বিষাদঘন মন্তব্য করেছিলেন স্বয়ং ভগবান। তিনি বলেছেন— যারা আপন অহংকার আর অভিমানে মত্ত-প্রমত্ত হয়ে ওঠে তারা যাঁদের কাছ থেকে মহদুপকার এবং সৌভাগ্য লাভ করে তাঁদেরই আর মনে রাখে না, এমনকী সুযোগ পেলে তাদের অপমানও করে— মত্তাঃ প্রমত্তাঃ বরদান্ বিস্মরন্তি অবজানতে। ভগবান বিষ্ণু কুশলী মানুষ। তিনি এক ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে হাতে কুশগাছি জড়িয়ে বৃকাসুরকে বললেন— দেখেই মনে হচ্ছে আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, অনেক দূর থেকে আসছেন বুঝি? একটু বিশ্রাম করে নিন, তারপর যদি আমাকে বিশ্বাস হয়, তাহলে জানাবেন আপনার সমস্যাটা কোথায়। বৃকাসুর ক্ষণেক বিশ্রাম করেই জানাল— সে কেন এতক্ষণ শিবের পিছনে দৌড়েছে এবং শিবের দেওয়া বর ঠিক কি না সেটা যাচাই করার জন্য আর কোনও নিরীহ উপায় তার জানা নেই। সব শুনে ভগবান বিষ্ণু বৃকাসুরকে বললেন— তুমিও যেমন! এইটুকু সাধারণ বুদ্ধি হল না তোমার। শিব একটা ভগবান! ভূত-পিশাচদের মোড়ল যে লোকটা, তার কথায় কখনও বিশ্বাস করতে আছে? আর এতই যদি বিশ্বাস, তাহলে নিজের মাথায় তুমি নিজেই হাত রেখে শিবের বরের প্রত্যয় করে দ্যাখো, দেখবে কিছুই হবে না। অসুর বিষ্ণুর কথা ঠিক ভেবে তক্ষুনি নিজের মাথায় হাত রাখল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভস্মস্তূপে পরিণত হল।

স্কন্দপুরাণের কাহিনিটি আমার জানা ছিল না, সেখবর পেলাম আমারই সঙ্গে মহাভারত-পুরাণ-কোষের নির্মাণ-কর্মে ব্যস্ত আমার ছাত্রী সুচেতার কাছ থেকে। সেখানে বৃকাসুর কালপৃষ্ঠ দানব। যদিও বৃকাসুরের চেয়েও কাহিনি হিসেবে দানব কালপৃষ্ঠের কাহিনি জনপ্রিয়তর। কেননা সেই কাহিনির সূত্র ধরেই দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য মোহিনী আট্টম-এর আংশিক পরিকল্পনা ঘটেছে, এমনকী মারাঠি গ্রন্থ শিবলীলামৃতে এই কাহিনিই আরও মধুর অনুভবে চিহ্নিত হয়েছে। এখানে শিব কালপৃষ্ঠ দানবকে ওই বর দিয়েছেন এবং দানবের পরীক্ষা-প্রবণতায় বৈকুণ্ঠে এসেও উপস্থিত হয়েছেন মহাদেব। মহাদেবের এই বিপত্তির কথা শুনে ভগবান বিষ্ণু এখানে অপরূপা মোহিনী রূপ ধারণ করেছেন। তারপর কালপৃষ্ঠের আশপাশে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই মোহিনী কালপৃষ্ঠের চোখে পড়ে যান। কালপৃষ্ঠ মোহিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিল। মোহিনী সেই প্রস্তাব শুনে হেসে বললেন— বিবাহের পর পত্নীরা স্বামীর অনুগতা হয়ে থাকবে, এটাই সামাজিক নিয়ম। তবে পুরুষের জন্য তেমন কোনও নিয়মই নেই। বিবাহের পর তুমি যে এই বিবাহ অস্বীকার করবে না, তার কী মানে আছে। কাজেই আমাকে যদি সত্যিই বিয়ে করতে চাও তবে নিজের মাথায় হাত রেখে দিব্যি দিয়ে বলো যে তুমি সত্যিই আমাকে বিবাহ করতে চাও। কামার্ত দানব পূর্বাপর চিন্তা না করেই নিজের মাথায় হাত রাখল এবং মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত হল।

মারাঠি গ্রন্থ শিবলীলামৃতে বৃকাসুর কিংবা কালপৃষ্ঠ দানবের নাম ভস্মাসুরই। তার জন্মও নাকি হয়েছিল শিবের গায়ে মাখা ভস্ম থেকেই। সে শিবের আরাধনা করে হস্তস্পর্শে ভস্ম করার বরও পেল। কিন্তু শিবের মাথায় সেই বর পরীক্ষা করতে যেতেই শিব পালালেন নিজভূমি কৈলাস ছেড়ে। ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার মাথায় হাত ঠেকানোর চেষ্টা করলে, তিনি বৈকুণ্ঠলোকে পালিয়ে গিয়ে বিষ্ণুর পিছনে গিয়ে লুকোলেন। এইভাবে দুই প্রধান দেবতাকে পালিয়ে যেতে দেখে ভস্মাসুর ঠিক করল এবার বিষ্ণুকেই সে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে যাবার পথেই ভস্মাসুর দেখতে পেল এক রমণীকে। এমন তার রূপ যে সে-রূপে বৈকুণ্ঠের বনোদ্যান ভেসে যাচ্ছে যেন। রমণী বিচিত্র বিভঙ্গে পুষ্পোদ্যান থেকে পুষ্প চয়ন করছিল। ইনি বিষ্ণুর সেই মায়া মোহিনী। মোহিনীর রূপ দেখে ভস্মাসুর তার পূর্বপরিকল্পনার কথা ভুলে গেল। সে আবেগপূর্ণ ভাষায় মোহিনীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব জানাল। মোহিনী বললেন— সে তো আমিও চাই। কিন্তু আমাকে বিয়ে করার একটা শর্ত আছে। আমি তো ভীষণ নাচতে ভালোবাসি, তাই আমি চাই— যে আমার নাচের সঙ্গে যে তাল মিলিয়ে নাচতে পারবে, প্রত্যেক নাচের মুদ্রা যে শিখে নিতে পারবে, তাকে আমি বিয়ে করব।

ভস্মাসুরের নাচ শেখা আরম্ভ হল মোহিনীর কাছে। সে দ্রুত উন্নতিও করতে লাগল। মোহিনী নানান মুদ্রায় প্রতিদিন নূতন বিভঙ্গ তৈরি করেন, অসুরও তাঁর অনুকরণে নূতনতর শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছিল অন্যমনস্ক প্রেমের প্রত্যয়ে। একদিন মোহিনী নাচতে নাচতে অসুরকে বললেন— এইভাবে নাচতে নাচতে তোমার হাতটা এনে রাখো মাথার ওপর। তবেই এই মুদ্রা শেষ হবে। অসুরের কোনও খেয়াল নেই। মোহিনীর মায়ারূপে সে এতটাই আচ্ছন্ন যে সে কোনও চিন্তা করল না এবং নাচতে নাচতে নিজের হাতের তালু নিয়ে রাখল মাথার ওপর। মুহূর্তের মধ্যে সে ভস্মে পরিণত হল।

জানিয়ে রাখি, মোহিনী এবং ভস্মাসুরের এই নাচ কিন্তু কেরলের বিখ্যাত মোহিনী-আট্টমেরও একটা অঙ্গ। আবার বিষ্ণুর এই মায়ামূর্তি কিন্তু যোগমায়া স্বরূপিণী বলে তিনি হরলীলার সহায়িকা। অর্থাৎ শিবের দৈব-চরিত্রের সরলতায় যদি তাঁর বিপদ ঘটে কোনও, তবে তাঁর পত্নীরূপিণী যোগামায়ার শক্তিই তাঁকে স্বস্থানে পুনঃস্থাপন করে। তবে কিনা শাস্ত্রীয় তর্কযুক্তিতে মোহিনী-বিষ্ণুকে শিবের আপন পত্নী হিসেবে প্রমাণ করতে পারলেও শিবের কামুকতার প্রসঙ্গ কিন্তু বারবার পুরাণগুলির মধ্যে এসেছে এবং তা এসেছে এই কারণেই যে নিতান্ত বিরাগী যোগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কতটা রমণীজনের কাছে গ্রহণীয়-রূপ, মেয়েরা তাঁকে কতটা পছন্দ করে। অবিবাহিত যুবতী মেয়েদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটানোর পৌরাণিক কথকতা তো শিবের সম্বন্ধে আছেই, তার সঙ্গে বিবাহিত স্ত্রী জনের পাতিব্রত্যও তিনি ভঙ্গ করেন— এই ঘটনার মধ্যে যেন কোথায় কৃষ্ণলীলার ছায়া পড়ে। তিনি মদন দহন বলেই হয়তো বা কৃপা-পারবশ্যে অঙ্গহীন অনঙ্গের আধিপত্য মেনে নেন।

আমরা পুরাণগুলির মধ্যে এমন অদ্ভুত বিকারও দেখেছি যেখানে শিবের কামুকতার ভাষা বাংলার মঙ্গলকাব্যের ভাষাকেও হার মানায়। একটি পুরাণে বলা হয়েছে যে, পুরাকালের কোনও এক সময় গন্ধর্ব, কিন্নর এবং মর্ত মানুষের ঘরের কোনও মেয়েকেও যদি সুন্দরী যুবতী দেখতেন, তাহলে শিব নাকি তাদের মন্ত্রের মাধ্যমে আকর্ষণ করে আনতেন নিজের কাছে, তারপর তাদের দূরে কোথাও নিয়ে যেতেন নির্জন তপস্যার ছলে। কিন্তু সেই দূরস্থানে কুটির নির্মাণ করে তাঁদের সঙ্গে নাকি মিলিত হতেন শিব— অতিরম্যাং কুটীং কৃত্বা তাভিঃ সহ মহেশ্বরঃ। এই ঘটনার মধ্যে আরও বড় খবর হল— শিবজায়া পার্বতী নাকি তাঁর স্বামীর এই চৌর্যমিলনের আকস্মিক প্রক্রিয়াগুলি ধরে ফেলেছিলেন এবং কী আশ্চর্য! তিনি তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সেই শিব-প্রেমমুগ্ধা রমণীদের চণ্ডালিনী হয়ে যাবার অভিশাপ দিয়েছিলেন। আমরা অবশ্য এই ঘটনার মধ্যে খানিক

boierpathshala.blogspot.com

তন্ত্রাচারের ইঙ্গিত পাই এবং সেই তন্ত্রাচারের মধ্যে চণ্ডালবিদ্যাও অন্যতম বটে।

শিবের এই মেয়ে-ভুলানো প্রবৃত্তিটাকে বাংলার মঙ্গলকাব্যের কবিরা তির্যকভাবেই দেখেছেন। পুরাণে শিব যেভাবে ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় গন্ধর্ব, কিন্নর, মানুষের মেয়েদের তুলে নিয়ে গেছেন, ভারতচন্দ্র সেই পরম্পরা বজায় রেখেই বলেছেন যে, মদনভস্ম করে শিবের কোনও উপকারই হয়নি— মরিল মদন/ তবু পঞ্চানন/ মোহিত তাহার বাণে/ বিকল হইয়া/ নারী তলাসিয়া/ ফিরয়ে সকল স্থানে।। / শিবের কামুকত্বের বর্ণনা চরমে উঠেছে মুনিপত্নীদের রতিবিভ্রমে। এটা অবশ্য বলেই নেওয়া ভালো যে, এই সব শৈব কামুকতার দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রেই অন্যতর এক দার্শনিকতার প্রতিষ্ঠা করে, বিশেষত শিবের চেয়েও শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা মাহাত্ম্য আমাদের পুরাণ-ইতিহাসে এতটাই যে, সেই সূত্রে শিবের কামুকতার বর্ণনা করাটা একটা প্রতীকী ব্যাপার হয়ে গেছে। আসলে ভারতবর্ষে লিঙ্গপূজার ভাবনাটা সবচেয়ে আদিম এবং প্রাচীন। শুধু এদেশে কেন সবদেশেই তাই। আর্য সংস্কৃতির শিষ্টবোধী মানুষেরা লিঙ্গপূজা বা শিশ্নদেবতার প্রচার রীতিমত ঘৃণা করেছেন। হয়তো সেই কারণেই রুদ্রশিব বৈদিক দেবতাদের যজ্ঞভোজনের পঙ্‌ক্তিতে ব্রাত্য ছিলেন প্রথমে। কিন্তু নিজের শক্তিতেই হোক অথবা ভারতবর্ষের আদিম প্রাচীন জনজাতির সংঘমুখ্যতায় রুদ্রশিবকে বৈদিক যজ্ঞের ভাগও যেমন দিতে হয়েছে, তেমনই ভারতবর্ষের আদিম অবশেষ লিঙ্গপূজাও রুদ্রশিবের একাত্মতাতেই দেবতা সংখ্যার মধ্যে পড়ে গেছে।

কিন্তু লিঙ্গপূজার মতো আদিম উর্বরতার প্রতীককে যদি প্রতিষ্ঠিত করতেই হয়, তবে শিবের মতো এক ছন্নছাড়া অনার্যাধিষ্ঠিত দেবতার কামুকতা বর্ণনা করা ছাড়া পৌরাণিকদের কাছে বিকল্পই বা কী ছিল! আমরা শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বামনপুরাণের মতো অনেকগুলি পুরাণেই শিবের কামুকতার বর্ণনায় দেখেছি— দেবদারু-বনবাসী মুনিরা সস্ত্রীক তপস্যায় বসেছিলেন শিবকেই সন্তুষ্ট করার জন্য। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব মুনিদের পরীক্ষা করার জন্য দারুবনে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁর প্রবেশের ধরনটা আর্যভাবিত সংস্কারের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। শিব প্রবেশ করলেন দিগম্বর হয়ে, সমস্ত গায়ে ভস্মমাখা, ললাটের তৃতীয় নয়ন ধিকি ধিকি জ্বলছে, গলাটি গরল-পানে নীল, মাথায় সর্পস্বদ্ধ জটা। অপিচ তাঁর মুখের ভাব-সাবও ভালো নয়। তাঁর আকার ইঙ্গিত এবং ক্রিয়া-কলাপ সব কিছুর মধ্যেই যৌনতার একটা প্রকট আভাস ফুটে উঠছে যেন— চেষ্টাঞ্চৈব কটাক্ষঞ্চ হস্তে লিঙ্গঞ্চ ধারয়ন্।

দারুবনে শিব যখন এইভাবে প্রবেশ করলেন শিবপুরাণের মতে সেই সময় নাকি মুনিরা সমিদাহরণ করতে দূরবনে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে শিবের প্রবেশ এবং বিকৃত রূপে এবং ভাবনায় শিব যেভাবে এসেছিলেন, তাতে নাকি মুনিপত্নীরা রীতিমতো মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন— মনাংসি মোহয়ন্ স্ত্রীনামাজগাম হরঃ স্বয়ম্। এই ঘটনায় মুনিপত্নীদের যে মোহাবেশ দেখা গেল, এর কোনও সত্য থাকতে পারে কি না সেটা চর্চার বিষয়। একদিকে তপোবৈরাগ্যে চিরসংবৃত মুনিপত্নীদের চরিত্র, অন্যদিকে শিবের এই প্রকটচেষ্ট মৈথুনের ইঙ্গিত— এগুলি প্রতিক্রিয়ার জায়গাতে রুচিহীনতার ইঙ্গিত হতে পারে, আধুনিক সংবেদনশীলতায় এগুলি কুরুচি বলেই পরিচিত হতে পারে, তবে অন্যজন-বিরহিত দারুবনে— যেখানে একজন মুনিপত্নীরও স্বামী উপস্থিত নেই, তখন একটি দিগম্বর শিব-পুরুষকে নিয়ে কী খেলা শুরু হতে পারে, আমরা সেই স্ত্রৈণ অথবা যৌন চর্চায় যেতে চাই না।

তবে কিনা লিঙ্গপুরাণ এখানে যে বর্ণনা দিয়েছে, তাতে মুনিপত্নীদের সংযম অবরুদ্ধ ছিল না, তাঁদের মনের মধ্যে নানা বিকার দেখা গেছে এবং বাইরেও সেটা এমন আকর্ষণের রূপ ধারণ করেছে যে, শিবকে দেখে মুনিপত্নীরা যেন পাগল হয়ে গেলেন। কেউ গান গাইতে লাগলেন, কেউ বাঁকা চাউনিতে শিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন।

আমরা শিবকে যতটুকু বিকারী অবস্থায় দেখেছিলাম তার থেকে বেশি বিকার দেখার আগেই মেয়েদের স্বামী মুনিরা এসে গেছেন সমিদাহরণ করে। তাঁরা এসব দেখে পরমেশ্বর শিবকে ছেড়ে দিলেন না। লিঙ্গপুরাণে তাঁরা শিবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলেও কোনও অভিশাপ উচ্চারণ করেননি, কিন্তু শিবপুরাণে মুনিদের অভিশাপে শিবের স্বয়ম্ভু লিঙ্গটিই খসে পড়েছিল এবং সেই থেকেই লিঙ্গপূজার প্রবর্তন হল। অবশ্য লিঙ্গপূজা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ কেন প্রাধান্য পেল, সে বিষয় তো আছেই, এ ছাড়াও পৃথিবীতে শিবের লিঙ্গপূজা প্রবর্তনের আরও কাহিনি আছে, বিশেষত জ্যোতির্লিঙ্গ, স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, পার্থিব লিঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বিষয়ে প্রবেশ করলে শিব আমার কাছে সুন্দরের থেকেও কঠিন হয়ে পড়বেন বেশি।

আমার দৃষ্টিতে শিবের চরিত্রে কামুকতার এই পৌরাণিক চর্বনা তৈরি হয়েছে শিবকে মনুষ্যোচিত ভাবে লীলায়িত দেখার জন্যই। এই যে শিবলিঙ্গ সৃষ্টির একটা উপাখ্যান পেলাম, তারও পিছনে তো অন্যতর এক পৌরাণিক কাহিনি আছে। একটি কাহিনি এইরকম যে হিমালয়-দুহিতা পার্বতী নাকি আগে কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন এবং অনেকগুলি পুরাণেই এ-কথা আছে যে, মহেশ্বর শিব নাকি কৃষ্ণবর্ণা পার্বতীর কালো রং নিয়ে দু-একবার হাসিঠাট্টাও করেছেন। সে ঠাট্টা খুব গভীর এবং সত্য না হলেও পার্বতী কালীর মনে তাতে গভীর ব্যথা লেগেছে। কেননা

boierpathshala.blogspot.com

জন্মের সূত্রেই তিনি পর্বতরাজ হিমালয়-পিতার গায়ের রং পেয়েছেন। দাক্ষায়ণী সতী দেহত্যাগ করে পার্বতী হবার সময়েই তাঁর গায়ের রং কালো ছিল বলে অনেক পুরাণেই বলা হয়েছে। হিমালয় তাঁর নামও দিয়েছিলেন কালী— রূপেণানুপমা কালী জঘন্যা মেনকাসুতা। তা কালো হন বা কালীই হন, বিয়ের পরেও মহেশ্বর শিব তাঁর গায়ের রং নিয়ে ঠাট্টা করবেন? শিব নাকি এমনও বলেছিলেন যে, আমার ভস্মভূষিত গৌর অঙ্গে তোমার তনুদেহখানি যেন চন্দনগাছে কালো সাপ জড়িয়ে থাকার মতো। একটি পুরাণে দেখা যাচ্ছে— কৈলাসে উর্বশীর মতো এক অপ্সরার সঙ্গে আলাপ করানোর সময় শিব বলেছিলেন— কালো কাজলের মতো দেখতে কালী আমার। তুমি এই উর্বশীদের মতো অপ্সরাদের সঙ্গে একটু আলাপ করো— কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে উর্বশ্যাদ্যপ্সরোগণৈঃ। এসব কথা, এমনকী সত্যি হলেও এমন ঠেস-মারা কথা কোন বিবাহিতা রমণীর ভালো লাগে? পার্বতী তাই ঠিক করলেন যে, তিনি তপস্যা করবেন গৌরী হবার জন্য।

অন্য পুরাণ বলেছে— স্বামী-স্ত্রীর এই ঝগড়াটা নাকি এত সহজ ছিল না। শিবের মুখে কালীনামে ক্রুদ্ধ হয়ে পার্বতী কালী বলেছিলেন— এই কালো রং যদি তোমার ভালোই না লাগে, তবে এতকাল এইভাবে আমাকে আটকে রেখেছ কেন? আর এতই যদি অরুচি এই শরীরটার ওপর, তাহলে দিনরাত এত সম্ভোগ-বিহার করলে কী করে আমার সঙ্গে-অরুচ্যা বর্তমানোঽপি কথঞ্চ রমসে ময়া? এই ক্রোধ-রসায়নের সঙ্গে পার্বতীর জবানিতে এমন একটা কথা শোনা গেল, যা আধুনিক প্রগতিশীলাদের মোটেই ভালো লাগবে না, কিন্তু এ-কথাও বড় সত্য যে, এমন রমণীও পৃথিবীতে আছেন যাঁরা আপন শরীর এবং শরীরের আকর্ষণ নিয়েও যথেষ্ট চিন্তিত থাকেন। সেই শরীরের পুরুষোপভোগ্যতার ভাবনা এমন স্তরেও পৌঁছয় যেখানে রমণী ভাবতে থাকে— এই শরীরের উপভোগ্যতাই যদি না থাকে তাহলে মেয়েদের উপযোগ প্রয়োজনটাই বা কোথায়— তথা সত্যন্যথাভূতা নারী কুত্রোপযুজ্যতে। হয়তো বা এই আত্মসচেতনায় রমণী নিজেই নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভোগ করে এবং একটি পুরুষ এখানে মাধ্যম-মাত্র। পার্বতী অবশ্য অত্যভিমানে শিবকে বললেন— স্বামীর ভোগের জন্যই তো মেয়েদের জন্ম হয়েছে— ভর্তু-ভোগৈকশেষো হি সর্গ এবৈষ যোষিতাম্— তা আমি কালো বলে সেই ভোগটাই যদি না হল, তাহলে ফরসা হতে চাই আমি। আমি কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ করে গৌরী হব— তস্মাদ্ বর্ণমিদং ত্যক্ত্বা— তা নইলে মরব— ন ভবিষ্যামি বা স্বয়ম্।

এত অভিমানের মধ্যে বিধাতার চক্রান্ত ছিল। নইলে শিবের মতো পার্বতী-প্রাণ দেবতা তাঁকে রমণীয় শয্যায় শুয়ে কালী-কালী বলে এমন বিচ্ছিরি নিন্দের কথা বলতেন না। কিন্তু দুবার কালো মেয়ে বলেছিলেন বলেই যে পার্বতীর এত অভিমান সেটা তো একদিকে শিবের স্ত্রৈণতার চেয়েও তাঁর স্বামীগত চেতনা বেশি প্রকাশ করে। বিশেষত শিবের যে চরিত্র পুরাণগুলিতে চিত্রিত তাতে যখন তখন যে কোনও সুন্দরী মেয়েই তাঁকে মোহগ্রস্ত করতে পারে, এটা যেন পার্বতীর 'অবসেশন' ছিল। নইলে ওই যে তিনি গৌরী হবার জন্য শিবের অনুমতি নিয়েই তপস্যা করতে গেলেন, তখন প্রিয়সখী বিজয়াকে তিনি সাবধান করে বলে দিয়ে গেলেন— আমার এই লম্পট স্বামীটার ব্যাপারে খেয়াল রেখো সারাক্ষণ। প্রথমত জানোই তো আমার সতীন আছে গঙ্গা, তাকে পেলে তো সব ভুলে যায়— পতির্মে জাহ্নবীপ্রিয়ঃ। এছাড়াও ও যে কখন কোন মেয়েকে ঘরে ঢুকিয়ে কী করবে— প্রবেশ্য নোপভোক্তা স্যাৎ— তুমি বাপু সর্বক্ষণ নজর রেখো আমার লম্পট স্বামীটার ওপর— রক্ষিতব্যো লম্পটোঽয়ং যথান্যাং মদ্‌গৃহে স্ত্রিয়ম্।

অন্য একটি পুরাণে দেখা যাচ্ছে— ফরসা হওয়ার তপস্যা করতে যাবার আগে পার্বতী আরও বেশি সচেতন। তিনি বিজয়া সখীর মতো এক মৃদু রমণীর ওপরে নির্ভর করে দূর তপস্যায় চলে যেতে পারেননি। তিনি এখানে শিবগণের অন্যতম বীরক, যিনি পার্বতীকে মা ডাকেন সব সময়, সেই বীরক কে দ্বারপাল হিসেবে নিযুক্ত করে তাঁকেই বলে গেলেন— আমার এই স্বামীটি কিন্তু লম্পট পুরুষ। আমি এখান থেকে গেলে তুমি দরজায় পাহারা দেবে সারাক্ষণ এবং আমার বাড়িটার প্রত্যেকটি ফুটোও খেয়াল করে দেখবে— কেউ ঢুকল নাকি— এষ স্ত্রী-লম্পটো দেবো যাতায়াং ময্যনন্তরম্। দ্বাররক্ষা ত্বয়া কার্যা...।

শিবের ব্যাপারে পার্বতীর এই সতত সন্দিহান চরিত্র দেখে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়— শিব চরিত্রের কামুকতা এবং তাঁর যৌনতাও অনেকটাই যেন পার্বতীরই সৃষ্টি। শিবের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এতটাই গভীর এবং গাঢ় যে, তিনি তাঁকে সন্দেহ না করে থাকতে পারেন না। পার্বতী এটাও জানেন যে তাঁর স্বামী শিবের যতই 'একটু-আধটু এটা-ওটা' থাকুক না কেন, তিনি পার্বতীর ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশি স্ত্রৈণ। এতটাই তিনি স্ত্রৈণ যে শিবের জন্য নির্ঝঞ্ঝাটে তিনি অভ্যঙ্গ স্নানটা পর্যন্ত সারতে পারেন না। কল্পনা করা যায় কী যে, পার্বতী তাঁর স্বামীর দৃষ্টিহীন নিরুপদ্রব স্নানের জন্য পুত্র গণেশের সৃষ্টি করেছিলেন।

পুরাণের সেই কাহিনিতে দেখা যাচ্ছে— একদিন পার্বতী তাঁর দুই সখী জয়া আর বিজয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। তখন শিব-পার্বতীর সদ্য বিবাহ হয়েছে। আলোচনায় বসে দুই সখী বললেন— দ্যাখো পার্বতী! শিবের যত অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গী এরা সব শিবের ঘরের লোক। তারাই আমাদের আজ্ঞাবহ হয়ে আমাদের দরজায় পাহারা দেয়। শ্বশুরবাড়ির লোকদের নিজের মনে করা খুব ভালো, কিন্তু তবু যেন মনের মধ্যে একটা খিঁচ থেকে যায়— তে সর্বেঽপি অস্মদীয়াশ্চ তথাপি ন মিলেন্মনঃ। কেননা কাজের সময় দেখবে, ওরা আমার স্বামীর কথা বেশি শুনছে। আমাদের কথা শুনছে না। জয়া-বিজয়া পরামর্শ দিলেন— তার চেয়ে যদি এমন হত যে একজন আমাদেরই লোক থাকত এখানে, একেবারে একান্তভাবে আমাদের, তাকে তুমিই রেখেছ— এমন যদি হত, বেশ ভালো হত তাহলে— একশ্চেবাস্মদীয়ো রক্ষণীয়স্ত্বয়ানখে।

কথাটা পার্বতীর মনে বেশ ধরল এবং এই একান্ত অনুচর যে সত্যিই প্রয়োজন, সেটা অচিরেই টের পেলেন পার্বতী। একদিন পার্বতী কন্যান্তঃপুরের ভিতর চারদিক-ঘেরা পুষ্করিণীর দ্বারে শিবানুচর নন্দীকে বসিয়ে স্নান করতে গেলেন সরোবরের জলে। এমন সময়— আমার তো মনে হয় বিবাহোত্তর অভ্যাসবশতই শিব এসে উপস্থিত হলেন দ্বারে। নন্দী তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে শিব এক ধমকে নন্দীকে দ্বারে বসিয়ে রেখে প্রবেশ করলেন ভিতরে— কদাচিন্ মজ্জমানায়াং পার্বত্যাং বৈ সদাশিবঃ। নন্দিনং পরিভর্ৎস্যেব...। পার্বতী ভীষণ অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত হলেন। স্নান করতে করতেই উঠে এলেন তিনি। শিবের সঙ্গে তাঁর এই মুহূর্তে কেমনতর সাক্ষাৎকার হল, তা বলা নেই এই পুরাণে। কিন্তু এই সময়েই পার্বতীর মনে হল একান্ত এক অতিবিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ চাই তাঁর— যে নির্বিচারে তাঁরই কথা শুনবে— মদাজ্ঞায়াঃ পরং ন্যান্যদ্ রেখামাত্রং চলেদিহ।

পার্বতী আনমনে পুষ্করিণীর জলে নামলেন আবার। হঠাৎই আনমনে পুকুরের পাশের নরম মাটি নিয়ে দুই হাতের কৌশলে

boierpathshala.blogspot.com

একটি সর্বাঙ্গসুন্দর মূর্তি তৈরি করে নাম দিলেন গণেশ। মূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠল এবং পার্বতী তাঁকে নানান বস্ত্রালংকারে বিভূষিত করে বললেন— বৎস! তুমি আমার পুত্র. সেইজন্য তুমি একান্তভাবে আমারই, তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি সম্পূর্ণ আমার বলতে পারি না— মৎপুত্রস্ত্বং মদীয়োঽমি নান্যথা ক্বচিদস্তি মে। তুমি আমার বলেই তোমাকে বলছি, আজ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করবে। একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এই দুয়োরে, কাউকে ঢুকতে দেবে না। তারপর একদিন পার্বতী সখীদের নিয়ে স্নান করতে নেমেছেন এবং যথারীতি শিব তাঁর ভূতগণ নিয়ে প্রবেশ করতে চাইলেন ভিতরে। গণেশ বললেন— আরে এই! এখানে কী করছ তুমি। আমার মা স্নান করছেন এখানে. এক্কেবারে এধার মাড়াবে না— মজ্জনার্থং স্থিতা মাতা ক্ব যাসি মা ব্রজাধুনা। শিব বললেন— আরে! আমি শিব— একথা বলেই যেই না তিনি ঢুকতে গেলেন. অমনি গণেশ বললেন— কে শিব, কীসের শিব? তোমার কীসের প্রয়োজন এখানে— কঃ শিবঃ কুত্র যাসি ত্বং কিমর্থং গম্যতে ধুনা।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে গণেশের লাঠির বাড়ি পড়ল শিবের পিঠে। একটা লাঠির বাড়িতে অবশ্য শিব মোটেই পিছুপা হলেন না এবং তিনি গণেশকে বললেন— অবোধ বালক! মূর্খ কোথাকার! আমি শিব, গিরিজা পার্বতীর স্বামী আমি— শিবোঽহং গিরিজাপতিঃ। গণেশ কিন্তু তবু ঢুকতে দেননি শিবকে এবং শেষে শিব গণেশের এই তর্কাতর্কি যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল এবং সে যুদ্ধও এমন যে. শনির দৃষ্টি-ফিস্টির প্রয়োজন হয়নি, শিব শেষপর্যন্ত শূলাঘাতে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। গণেশের এই মুণ্ডচ্ছেদের ঘটনা পার্বতী এবং শিবের মধ্যে বিরাট ব্যবধান তৈরি করে। সমুদ্যত ক্রোধে পার্বতী জগদ্ধ্বংস করে দেবেন বলে অতিতীব্রা হয়ে ওঠেন। অবশেষে. শিব নিজে উদ্যোগ নিয়ে আপন অনুচরদের দিয়ে উত্তর দিকে প্রথম-দৃষ্ট সেই একদন্ত হস্তীর মাথা এনে যুক্ত করেন গণেশের শরীরে। পার্বতীর প্রতি প্রেমবশত শিব গণেশকে আপন পুত্র বলে মেনে নিয়ে তাঁর মস্তকাঘ্রাণ করলেন পরম স্নেহে।

গণেশ কিংবা পার্বতী আমাদের উপপাদ্যের মধ্যে ছিলেন না. আমাদের উপপাদ্য ছিল শিবের স্ত্রৈণতা এবং কামুকতা। যদিও এই স্ত্রৈণতা এবং কামুকতা শিব-শক্তির পরস্পরাকর্ষণের দার্শনিকতায় সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায়। লক্ষণীয়, শিবের একটি অসাধারণ ভাবনা আছে শিবের অর্ধনারীশ্বরমূর্তিতে। এই মূর্তিতে অর্ধাংশ শিব এবং অর্ধাংশ পার্বতী। কিন্তু পুরুষ-স্ত্রীর দুই অর্ধ থাকলেও মূর্তিটা এককভাবেই শিবমূর্তি। অর্ধনারীশ্বরের প্রতিমা গড়তে গেলে শিবের মাথায় চন্দ্রকলা. ললাটে তৃতীয় নয়ন দেবার পর তাঁর বামার্ধের বাঁ হাতটিতে শূল কিংবা পিণাকধনু যেমন দেওয়া যায়, তেমনই বিকল্পে সেই বামার্ধে গিরিসুতা পার্বতীর অর্ধাংশ স্থাপন করা যায়। মূর্তিটা কিন্তু শিবেরই হল। তার মানে তত্ত্বগত ভাবে শিব এবং শিবানী অভিন্ন, মহাকবি কালিদাস যেমন লিখেছেন— এই অভিন্নতা শব্দ আর অর্থের মতো ভেদাভেদের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত— বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ... পার্বতী-পরমেশ্বরৌ। আমরা বলব পুরাণগুলির মধ্যে পরস্পরের জন্য শিব-শিবাণীর এই যে আকুলতা কিংবা কামুকতা. সেটা এই তাত্ত্বিক একাত্মতার কারণেই।

শিব কী করে অর্ধনারীশ্বর হলেন. তার একটা কাহিনি আছে পুরাণে। পার্বতী নাকি একদিন শিবের বুকে নিজের ছায়া দেখে ভেবেছিলেন— অন্য কোনও রমণী এসে আশ্রয় নিয়েছে শিবের হৃদয়ে। খানিক রেগেও গিয়েছিলেন তিনি আপন সন্দেহের তাড়নায়। কিন্তু শিব তাঁকে প্রমাণ দেখিয়ে আশ্বস্ত করলে পার্বতী শেষপর্যন্ত সত্যি বাস্তবটা বুঝতে পারেন। কিন্তু স্বামীর শরীরের সঙ্গে আপন শরীরের পৃথকত্ব বোধ হয়তো বা তাঁকে পীড়া দিত। পার্বতী শিবের শরীরে আপন শরীরখানি মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। শিবকে তিনি বলেছেন— যাতে সব সময় আমি তোমার সাহচর্য পাই, তোমার সমস্ত গায়ের স্পর্শ যাতে আমার সর্ব অঙ্গে লাগে, তেমনই নিত্য আলিঙ্গন- সুখে দিন কাটাতে চাই আমি— সর্বগাত্রেণ সংস্পর্শং নিত্যালিঙ্গন-বিভ্রমম্। শিব বললেন— তুমি যেমনটা চাইছ তেমনটাই হবে। তুমি যদি তোমার শরীরটাকে দুই অর্ধ ভাগ করতে পারো, তাহলে আমার শরীরে তোমার অর্ধ শরীর হরণ করে নেব— শরীরস্যার্ধহরণং ভূয়স্তব যথেপ্সিতম্।

নিজের অর্ধশরীর ত্যাগ করে সেই দক্ষিণার্ধে পার্বতীর বামার্ধ গ্রহণ করে শিব তো অর্ধনারীশ্বর হলেন, আমরা মেনেও নিলাম যে, তাত্ত্বিকভাবে পুরুষ প্রকৃতিকে গ্রহণ করলেন আপন অঙ্গে— শক্তিমান আর শক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে একাকার হলেন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তির মতো দার্শনিক খুশি হতেই আমার এক মহাকবি অসামান্য একখানি কবিতা লিখলেন। সে কবিতায় ময়ূরবাহন কার্তিক প্রশ্ন করলেন গজমুখ গণেশকে। বললেন— দাদা। একটা কথার উত্তর দাও তো। আমাদের মা-জননীকেও দেখলে, আর দেখলে আমাদের পিতাকেও - দু'জনেই তো একাকার হয়ে গেছেন একই শরীরে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই কথা ভেবে যে, তাঁদের মধ্যে তো কথাই হয়েছিল যে দু'জনের এক-একটি অর্ধ হরণ করে পূর্ণ এক শরীর তৈরি হবে। তাই হল, এক-এক অর্ধ মিলে তাঁরা অর্ধনারীশ্বর হলেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল— পিতা এবং মাতা দু'জনেরই আর দুই শরীরার্ধ গেল কোথায়— বলতে পারো দাদা, তদর্ধং চার্ধঞ্চ ক্ব তু গতমর্ধার্যঃ কথয়তু? এই কথার উত্তর গণেশ দিয়েছেন এমনই চতুর বিদগ্ধতায়, যেটা ভাবলে এই শ্লোকের লেখক কবির ওপর শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে যায়। গণেশ বলেছিলেন— শিব-শিবানীর আর দুই অর্ধশরীর নিয়েই সম্পূর্ণ এই জগতের নর-নারীর সত্তা তৈরি হয়েছে। এই জগতের যত পুরুষ আর নারী, তারা সবাই আমাদের জনক-জননীর পরিত্যক্ত দুই শরীরার্ধ— তাতেই তৈরি হয়েছে জগতের দুই মানবার্ধ পুরুষ এবং রমণী— জগত্তত্তদ্ জাতং সকল নর-নারীময়মিতি।

কবি তাঁর অসামান্য ব্যঞ্জনাশক্তিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন শিব শিবানী যে অসামান্য শরীরাকর্ষণে একের শরীরে অন্য শরীরের প্রবেশ ঘটালেন, সেই তীব্র আকর্ষণ কিন্তু জগতের দুই জীবনসত্তার মধ্যেও রয়ে গেল। একটি পুরুষ, কিংবা একটি রমণী— দু'জনেই কিন্তু একে অন্যের পরিপূরক। প্রত্যেকেই কিন্তু অর্ধেক, পূর্ণতার জন্য তাদের পারস্পরিক অপেক্ষা আছে, সেই অপেক্ষার মধ্যে আছে প্রেম, ভালোবাসা এবং শারীরিক আকর্ষণ— পৃথিবীর তিন সত্য। কালিদাসের মতো মহাকবি এই সত্য দিয়েই অর্ধনারীশ্বর শিবের কথা বলেছিলেন— যিনি আপন প্রেমে পার্বতীর শরীরার্ধ হরণ করেছিলেন— প্রেম্না শরীরার্ধহরাং হরস্য— সেই প্রেমই অন্তর্গত মানসী বৃত্তি হিসেবে কাজ করে জগতের সমস্ত নর-নারীর মধ্যে এবং তারাও এক হতে চায়, পূর্ণ হতে চায়— আমার কবির ভাষায় সেই দুই পরিত্যক্ত শিবাংশ জগতের নর-নারী— তারাও একাকার হওয়ার তপস্যায় বসে আছে চিরকাল। পরম শিবের কামুকতার বিশ্রান্তি কিন্তু এইখানেই, আর সেটা বুঝলে আমাদের দেবতার কামুকতা নিয়ে পাশ্চাত্য পাকাদের আর লম্ফঝম্প করার সুযোগ থাকবে না, বরঞ্চ ওদেরই শব্দ চুরি করে এটাকে একটা দশাসই নাম দিয়ে বলব এটা কামুকতা নয় হে বাছা! এ হল Cosmic desire.

boierpathshala.blogspot.com

॥ পাঁচ ॥

আমরা আগে একবার শিবের জীবনে অন্য রমণীর প্রসঙ্গান্তরে গঙ্গার কথা উল্লেখ করেছিলাম। বলেছিলাম— শিবজায়া পার্বতী সবচেয়ে সন্দেহ করতেন গঙ্গাকে এবং কোনও দ্বিধা না রেখে বলেছিলেন যে, জাহ্নবী গঙ্গাকে কিন্তু আমার স্বামী বড় বেশি পছন্দ করেন, কাজেই সাবধানে রাখতে হবে এই স্বামীটিকে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে গঙ্গার হাত থেকে, তাকে আমারই ঘরে ঢুকিয়ে আমারই সর্বনাশ করবে এই শিব— প্রবেশ্য নোপভোক্তা স্যাৎ পতির্মে জাহ্নবীপ্রিয়ঃ। প্রকৃত জায়গায় গঙ্গাকে নিয়ে পার্বতীর এই সন্দেহের কারণ অবশ্যই শিবের শরীরে গঙ্গার অবস্থিতি। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে সেই মানস সরোবর থেকে মুক্ত হয়ে কতগুলি গিরিশৃঙ্গের মধ্য দিয়ে তির্যক গতিতে গঙ্গা সমভূমিতে নেমে এসেছে। এতগুলি গিরিশৃঙ্গই কিন্তু শিবের জটাজালের প্রতীক। আমাদের প্রিয়বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু যে প্রাবাদিক বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন— গঙ্গা তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? মহাদেবের জটা হইতে— এই পৌরাণিক ভাবনা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন যে, তুষারমৌলি হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির চারদিকে ধূমপুঞ্জের মতো যে জলকণার সমষ্টি, সেটাই আসলে হরজটা। এই হরজটার মধ্যে আবদ্ধ গঙ্গাই কিন্তু শিবজায়া পার্বতীর সতীন। পার্বতী হিমালয়ের মেয়ে, গঙ্গাও হিমালয়ের ঘরের মেয়ে, ফলে কবিরা, পৌরাণিকেরা এইভাবেই গঙ্গাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন— নগরাজ হিমালয়ের দুই মেয়ে ছিল মেনকার গর্ভে। তাঁদের মধ্যে গঙ্গা আবার বড় মেয়ে— তস্যা গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।

আবার এমনও পুরাণ প্রসিদ্ধি আছে যে, দাক্ষায়ণী সতী যোগবলে দেহত্যাগ করে পরের জন্মে নিজেকে দুই ভাগ করে গঙ্গা আর উমারূপে হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মালেন। গঙ্গাই জ্যেষ্ঠা ভগিনী। কেমন করে শিবের বিয়ে হয়েছিল সে-কথা সবিস্তারে কোনও পুরাণেই নেই, কিন্তু পরবর্তী কালে স্কন্দ-কার্তিকেয়র জন্মবীজ শিববীর্য গঙ্গাতেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেইজন্যেও গঙ্গা যেমন শিবের পত্নী, তেমনই একটি পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপদী গঙ্গার উৎপত্তি কথা বলতে গিয়ে বারবার গঙ্গাকে শিবজায়া, শিবভামিনী বলা হয়েছে। দেবতারাই নাকি গঙ্গাকে তুলে দিয়েছিলেন শিবের হাতে— তিনি সতী দাক্ষায়ণীর অংশ বলে। সেই থেকে গঙ্গাকেও শিব মাথায় করে রাখেন। তবে পুরাণ কাহিনিতে গঙ্গাকে শিরে ধারণ করার কাহিনিতে ভগীরথের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেখানে ভগীরথের তপস্যায় গঙ্গা শিবের জটা থেকে মুক্ত হলেও শিবের জটাজালেই তাঁর নিত্যবসতি। তাঁর নামই গঙ্গাধর। কিন্তু গঙ্গা শিবের মাথায় থাকেন, গঙ্গা শিবের জটাজালে আবদ্ধ, গঙ্গার জল নীচের দিকে মর্তভূমিতে নেমে আসছে এবং গঙ্গা হিমালয় প্রভবা বলেই হিমালয়-সুতা পার্বতীর সতীন— এতগুলি বাস্তবকে কেন্দ্র করে শিবের জীবন নিয়ে কবিরা যে কত মধুর কবিতা লিখেছেন, তা বলে শেষ করতে পারব না।

কবির ধারণা— পৌরাণিক বিস্তারে শিবের জটাজুট মধ্যে গঙ্গার বসতির কারণ যাই থাক না কেন, আসল কারণটা লুকিয়ে শিবের শারীরিক সমস্যার মধ্যে। আমাদের যেমন হয়— খুব গরম লাগলে আমরা স্নান করি, শরীরে জ্বালা-পোড়া হলে স্নান আরও বাড়ে, মাথা গরম হলে মাথায় জল ঢালি, আরও কত শত জল-চিকিৎসায় আমরা ঠান্ডা হবার চেষ্টা করি। কবি বলছেন— শিবেরও তাই হয়েছে। সেই যখন তিনি বিষপান করে নীলকণ্ঠ হলেন, তদবধি তাঁর শরীর জ্বলে যায়, বিষের জ্বালায়। আবার অহিভূষণ শিবের গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিষাক্ত সাপ, সেই সাপের নিঃশ্বাসেও তাঁর গা জ্বলছে সবসময়। এর ওপরে আছে তার ললাটফলকে তৃতীয় নয়নে বহ্নি। যে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে সব সময় এবং তা সরাসরি মাথা গরম করে দিচ্ছে শিবের। কবি বলেছেন যে, সারা শরীরে এই অবিরাম জ্বালাপোড়া ঠান্ডা করার জন্যই গঙ্গাধর শিব শীতলজলা গঙ্গাকে আর মাথা থেকে নামিয়ে দেবার সাহস পান না— ইতি গঙ্গাধরো গঙ্গাম্ উত্তমাঙ্গান্ন মুঞ্চতি। শুধু মাথা ঠান্ডা রাখার জন্যই এক রমণীকে মাথায় তুলে রেখেছেন শিব।

কিন্তু এই অজুহাত তো সতীন কাঁটার সহ্য হবার নয়। তিনি তো গঙ্গাকে শীতসলিল নদী হিসেবে দেখেন না, তিনি তাঁকে এক রমণী হিসেবেই দেখেন। বিশেষত শিবের জটাজালে তাঁর দর্শনীয় শোভাটুকুও কম নয়। গঙ্গা শিবের জটায় শোভা পান মুক্তোমালার মতো— ললাটদেশে পতিতাং মালাং মুক্তাময়ীমিব। কিন্তু এত শোভা সত্ত্বেও প্রখরা পার্বতীর জন্য শিবভামিনী গঙ্গাকে একটু আত্মগোপন করেই থাকতে হয় এবং শিবের জটাজুট সে ব্যাপারে কিছু সুবিধেও দেয়। কিন্তু তাই বলে মাঝে-মাঝেই তিনি সেই জটাজাল ভেদ করে বাইরে উঁকি দেন না, তা নয়। ঠিক এইরকম একটা পরিস্থিতি অবলম্বন করেই মুদ্রারাক্ষসের নাট্যকার বিশাখদত্ত তাঁর নাটকের নান্দীশ্লোক উচ্চারণ করেছেন।

সেকালে কাব্য-নাটকের আরম্ভে নির্বিঘ্ন গ্রন্থপরিসমাপ্তির জন্য যে মঙ্গলাচরণ-শ্লোক লেখা হত, সেই নান্দীর মধ্যেই নাটকের বিষয়বস্তুর অবতারণা করে দেওয়াটা নাট্যকারদের বুদ্ধি চাতুর্যের পরিচয় দিত।। মুদ্রারাক্ষসের নাট্যকার তাঁর নাটকের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্য লাভের রাজনীতি কূটভাবে ব্যক্ত করবেন। সেই রাজনীতিতে শঠতা, প্রবঞ্চনা এবং ধূর্ততা সবই থাকায় নাট্যকার বিশাখদত্ত সেই সরল-সোজা শিবকে এমন অদ্ভুত কৌতুকে দেখাচ্ছেন যে, তাতে আমাদের বহুবিবাহকারী পুরুষের বিপন্নতাটাও প্রকট হয়ে ওঠে। কবির দৃষ্টিতে শিবজায়া পার্বতী হঠাৎই একদিন শিবকে বাগে পেয়ে বললেন— ধন্যিমানি ওটা কে গো তোমার মাথায়? একেবারে মাথায় করে রেখেছ— ধন্যা কেয়ং স্থিতা তে শিরসি? শিব চটজলদি জবাব দিলেন— কেন? এ তো শশিকলা? পার্বতী 'শশিকলা' শব্দটিকে চন্দ্রলেখা, 'চাঁদের মতো সুন্দর' ধরেই পুনঃপ্রশ্নে বললেন— তা তোমার এই চন্দ্রলেখার নামটা শুনি একটু। নামটা বল— কিং নু নামৈতদস্যাঃ।

শিব সমূহ বিপদে পড়েছেন। আমতা-আমতা করে বললেন— কথাটার মানে কী? নাম তো বললামই— শশিকলা। আর এ নাম তুমি যথেষ্টই জানো, তোমার পরিচিত নাম, তুমি যে কেমন করে ভুলে যাও এত, সেটা ভেবে পাই না— পরিচিতমপি তে বিস্মৃতং কস্য হেতোঃ? পার্বতী আর রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। বেশ রাগত স্বরেই বললেন— আমি চাঁদের কথা একবারও জিজ্ঞাসা করিনি, আমি ওই মেয়েছেলেটার কথা জিজ্ঞাসা করছি, যাকে মাথায় তুলে রেখেছ তুমি — নারীং পৃচ্ছামি নেন্দুম্। শিব এবার ফাঁপরে পড়ে পার্বতীর সখী বিজয়াকে সাক্ষী মেনে বললেন— আচ্ছা তুমিই বলো দেখি, বিজয়া! চাঁদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদি চাঁদ না হয়, তাহলে আর কী করার থাকতে পারে আমার! কবি এইবার তাঁর মাঙ্গলিক সিদ্ধান্ত শোনাচ্ছেন— এইভাবে নানা ছলনায়, নানা শঠতায় সুরনদী গঙ্গাকে যিনি দেবী পার্বতীর কাছ থেকে লুকোতে চাইছেন সেই শিবের শঠতা যেন এই নাটকের দর্শক-শ্রোতাকে রক্ষা করে— দেব্যা নিহ্নোতুমিচ্ছোরিতি সুরসরিতং শাঠ্যমব্যাদ্ বিভোর্বঃ।

boierpathshala.blogspot.com

নাট্যকার কিন্তু শিবকে সর্বব্যাপী বিভুতত্ত্ব বলে জানেন। কিন্তু লীলাবলে তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে তাঁকে নিয়েই যে ঈর্ষা-অসূয়া তৈরি হয়েছে এবং সেটা থেকে বাঁচার জন্য সরলমনা মানুষ হিসাবে শিবও যে শঠতা অবলম্বন করতে পারেন, সেই শঠতাই তাঁর নাটকের প্রতিপাদ্য বস্তু বলে শিবকে সেইভাবেই কাব্যমূর্তিতে প্রকাশ করেছেন বিশাখদত্ত। আসলে কবিদের কাছে শিবের চেহারা থেকে আরম্ভ করে তাঁর বসন-ভূষণ, তাঁর ভূত-প্রমথের অঙ্গপাঙ্গ, তাঁর দুই ছেলে গজানন গণেশ আর ষড়ানন কার্তিক এবং এগুলির সঙ্গে শিবের বিচিত্র অভ্যাস— তাঁর শ্মশানবাস, মাদকাভ্যাস, তাঁর সর্পভূষণ, তাঁর কৃত্তিবাস, তাঁর তিনটি চোখ— এইসব পৌরাণিক উপকরণ কিন্তু পরবর্তী সমস্ত কবিদের কবিত্ব-মাধুর্য বাড়িয়ে দিয়েছে— শিব লীলায়িত হয়েছেন মনুষ্য-লোকের আদর্শে। আর মানবায়িত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি কৌতুক মধুর হয়ে ওঠে।

অথচ দেবত্বের জায়গায় শিবের সমস্ত অভ্যাসের মধ্যেই তো দৈব কারণ আছে। যেমন তিনি কৃত্তিবাস, গজচর্ম তাঁর পরিধানে। পৌরাণিক বিবরণে অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় নীল নামে এক অসুর গজরূপ ধারণ করে যুদ্ধ করছিল। এই অবস্থায় শিবানুচর গণদেব বীরভদ্র সিংহরূপ ধারণ করে নীল-অসুরকে বধ করেন এবং তাঁর গজচর্ম ছাড়িয়ে শিবকে তা উপহার দেন। শিব সঙ্গে-সঙ্গে সেই গজচর্ম পরিধান করে কৃত্তিবাস হলেন— ততঃ প্রভৃতি রুদ্রো'পি গজচর্মপটো'ভবৎ।

শিব নাকি ত্রিলোচন, দু'টি দৈব চক্ষু ছাড়াও তাঁর তৃতীয় একটি নয়ন আছে; কেউ বলেন সেটা জ্ঞান-চক্ষু, কেউ বলেন সে চোখে আগুন আছে। মহাভারতে শিবের তৃতীয় নয়ন তৈরি হওয়ার একটা কারণও দেওয়া আছে। একদিন মহাদেব বসেছিলেন হিমালয়ে, তপস্যা কিছু শিথিল হয়েছে সেই সময়। হঠাৎ পার্বতী শিবতুল্য কৃত্তি পরিধান করে রুপোর কলসিতে সর্বতীর্থের জল নিয়ে উপস্থিত হলেন শিবের কাছে এবং হঠাৎই নর্মবশে দুই হাতে ঢেকে দিলেন শিবের দুই চোখ— হরনেত্রে শুভে দেবী সহসা সা সমাবৃণোৎ। শিবের চোখ বন্ধ হয়ে গেল মানে জগতের সমস্ত কর্মপদ্ধতি বন্ধ হয়ে গেল, অন্ধকার হয়ে উঠল জগৎ— সংবৃতাভ্যাস্তু নেত্রাভ্যাং তমোভূতমচেতনম্। সূর্য চন্দ্রহীন জগৎ প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই অবস্থায় শিবের ললাট ভেদ করে আদিত্য-সূর্যের মতো তাঁর তৃতীয় নয়ন তৈরি হল— তৃতীয়ং চাস্য সম্ভূতং নেত্রমাদিত্যসন্নিভম্। মহাভারতে শিবের এই তৃতীয় নয়ন কিন্তু দগ্ধ করতে বসেছিল সমস্ত হিমালয় পাহাড়, পার্বতীর পিত্রালয়। অবস্থা বুঝে পার্বতী সরিয়ে নেন তাঁর দুই হাত এবং সৃষ্টি বেঁচে গেল তাতে। কিন্তু তাই বলে তৃতীয় নয়ন আর অন্তরিত হয়ে রইল না তাঁর ললাটদেশের তলায়। সূর্যাগ্নি সদৃশ সেই তৃতীয় নয়ন শিবের নতুন বিশিষ্টতা তৈরি করল এমনকী বিকারও বটে।

বিকার বলছি এই কারণে যে, পাণিনি ব্যাকরণের ধারায় শিক্ষিত জনেরা বলেছেন, পায়ে খোঁড়া হওয়া, কিংবা চোখে অন্ধ হওয়াটা যেমন সাধারণ থেকে অন্যরকম বা পৃথক বলেই সেটা একরকমের বিকার, তেমনই এইসব অঙ্গহানির মতো শরীরের মধ্যে অঙ্গের আধিক্য একটা বিকার বিকার মানে বিকৃতি, প্রকৃতি থেকে যা অন্যরকম। সেই অর্থে শিবের তৃতীয় নয়নকেও বিকার বলতে কোনও দ্বিধা করেননি প্রাচীন বৈয়াকরণের। তাঁরা অঙ্গ বিকারের সূত্রে উদাহরণ দিয়েছেন— মুখেন ত্রিলোচনঃ। নয়নাধিক্যের এই বিকার মাথায় রেখেই শিবের আরেকটা নামও হয়ে গেল বিরূপাক্ষ। কত স্তব-স্তুতির মধ্যে এই বিরূপাক্ষ নামটি এসেছে, কিন্তু চিরকালের উপাধি-উদাসীন শিব এই অভিধায় রুষ্ট হননি কখনও।

এইসব বৈকারিকতা তিনি তুচ্ছ মনে করেন বলেই নিজে বিকার নিয়ে গল্প বলতেও তাঁর বাধে না। মহাভারতে শিব ত্রিলোচন হবার পরেই পার্বতী কতকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন প্রিয়তম শিবকে। সেই প্রশ্নের মধ্যে অনেক বিকার সম্বন্ধেই তাঁর প্রশ্ন ছিল। কেমন করে এই তিন চক্ষু হল তোমার, কেনই বা পাঁচ মাথায় পঞ্চানন হলে তুমি, কেনই বা মাথায় এমন জটা, কেনই বা এমন সকলের অস্পৃশ্য শ্মশানে থাকো তুমি— এসব প্রশ্ন শৈলপুত্রী পার্বতীর মুখেই এসেছে। এর উত্তরে প্রথমে ত্রিনয়নের জবাবটা ছিল চরম দার্শনিক, আর পঞ্চাননের জবাবদিহিটা গল্পের মুখে দার্শনিকতা। শিব বলেছিলেন, আমার এই তৃতীয় নয়ন ছাড়া আর উপায় কী ছিল বলো? তোমার আর কি, তুমি তো বালিকার মতো চপলতায় দুই হাতে রুদ্ধ করে দিলে আমার দু'টি চক্ষু। তাতে পৃথিবীতে সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, সমস্ত জগৎ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল আমার শশী-সূর্য-সদৃশ চোখ দু'টি ঢাকা পড়ায় নষ্টাদিতো তথা লোকে তমোভূতে নগাত্মজে। সেই তামসী সৃষ্টির মধ্যে সকলকে জীবিত রাখার জন্যই তো এই দীপ্ত তৃতীয় নয়নকে সৃষ্টি করতে হল— তৃতীয়ং লোচনং দীপ্তং সৃষ্টং মে রক্ষতা প্রজাঃ।

এক মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে পড়ে যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের আর এক প্রশ্নোত্তরী কথা। রাজর্ষি জনক প্রশ্ন করছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে। এই প্রশ্নোত্তরীর মধ্যে আস্তে আস্তে প্রকট হয়ে উঠছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পর্যায়গুলি। জনক জিজ্ঞাসা করলেন— এই যে হাত-পাওয়ালা ব্যবহারিক পুরুষ যত, তারা কোন জ্যোতির প্রেরণায় দৈনন্দিন ব্যবহার-জীবন চালায় কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন— আদিত্যজ্যোতি। আদিত্য সূর্যের আলোক-চৈতন্যেই কিন্তু আমরা দিনান্তের রাত্রিঘুম থেকে জেগে উঠি, চৈতন্য লাভ করি। জনক বললেন— তা বেশ! আদিত্য সূর্য যখন অস্তমিত হন, তখন কোন জ্যোতিঃস্বরূপতায় ব্যবহারিক জীবন চালায় ব্যবহারী মানুষ। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আদিত্য সূর্য অস্তমিত হলে চন্দ্রের জ্যোতিতে মানুষ স্থিতিলাভ করে, গমন করে, কর্ম করে। এই পরম্পরায় ক্রমে অগ্নির কথা এসেছে, তারপরে এসেছে শব্দের কথা। অর্থাৎ সূর্যালোক, চন্দ্রালোক, এমনকী অগ্নিকৃত দীপিকাগ্নিও যদি নির্বাপিত অস্তমিত থাকে, তাহলে শব্দই সেখানে জ্যোতিরালোকের কাজ করে। সেই কারণে

boierpathshala.blogspot.com

অন্ধকারের সময় যখন নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখা যায় না, তখন শব্দই আলোর কাজ করে।

জনক রাজর্ষি এবার চরম প্রশ্ন করলেন— আদিত্য অস্তমিত হলে, চন্দ্রও অস্তমিত হলে, অগ্নি শান্ত-নির্বাপিত হলে, এমনকী শব্দ-বাক্যও যদি শান্ত হয়ে যায়, তবে কোন বস্তু পুরুষের কাছে আলোকজ্যোতির কাজ করে—

অস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তে ঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন— আত্মাই তখন জ্যোতিস্বরূপ হয়ে ওঠে। এর পর যাজ্ঞবল্ক্য আত্মজ্ঞানের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে এসে জানাই যে, শিবের তৃতীয় নয়নও এই আত্মজ্ঞানের জ্যোতি বহন করে। এখানেও আদিত্য-সূর্যে জ্যোতি অস্তমিত হয়েছে কিন্তু সেই সূর্যকে চন্দ্র এবং অগ্নির আলোক-প্রতীক বলেই ধরে নিতে হবে। সমস্ত আলোক অস্তমিত হওয়ার পর পৃথিবী যখন নিরালোক অন্ধকারে আবৃত, তখনই শিবের তৃতীয়-নয়নের উদ্ভব, এই নয়ন তাই জ্ঞান-স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ।

এই তৃতীয় নয়নের প্রতীকে কিন্তু শিবের বৃষবাহনের কথাও আসবে। পার্বতী এই প্রশ্নও করেছিলেন। বলেছিলেন— সকল দেবতার বাহনগুলি কত সুন্দর। আর তোমার বাহন এমন অসুন্দর কেন— বাহনেষ্বত্র সর্বেষু শ্রীমৎস্বন্যেষু সত্তম। শিব অবশ্য বলেছিলেন, ভগবান ব্রহ্মা সুরভী গাভী সৃষ্টি করার পর তারা নানা বর্ণের নানা প্রকারের হল। এদিকে সুরভীর বাচ্চার মুখ থেকে দুধের ফেনা এসে আমার গায়ে লাগল, তাতে আমার বেশ রাগ হল। আমার রাগ ভুলিয়ে ভগবান ব্রহ্মা তখন আমাকে দিলেন এই বৃষ— আমার বাহন এবং আমার রথের চিহ্নও এটা। এমনকী বৃষ আমারই প্রতীক—বৃষধ্বজং ধ্বজার্থং মে দদৌ বাহনমেব চ।

আমরা অবশ্য বৃষ শব্দটা একেবারে ষাঁড় অর্থে ভাবি না। কেন না বেদের মধ্যে স্বয়ং রুদ্র-শিবকেই বৃষভ বলা হয়েছে এবং এই শব্দের অর্থ যিনি অভীষ্ট বর্ষণ করেন। আবার বৃষভ-শব্দের অর্থ বীর্যসম্পন্ন পুরুষ, যিনি সন্তান সৃষ্টির জন্য বীজ বর্ষণ করতে পারেন, ফলে উপযুক্ত পুরুষ হিসাবেই বৃষভ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ঋগবেদে। এখানে সেই গল্পটার মধ্যেও বহুতর সুরভী গাভীর বিপরীতে শিব কিন্তু বৃষভ উপহার পাচ্ছেন এবং তিনি নিজেও বৃষভ— এখানে সেই নারী-পুরুষের রূপকও খাটে। খাটে প্রকৃতি-পুরুষের রূপকও। সবার শেষে বলি— আমরা যাকে 'ডিসিপ্লিন' বলি, 'জাস্টিস' বলি, 'অরডিন্যান্স' বলি, 'এথিকস' বলি, সেই সব কিছুর বোধক শব্দ হল ধর্ম। সেই ধর্মকে বলা হয় বৃষ, জ্ঞানকেও বলে বৃষ। আমার মাস্টারমশাই বলেছিলেন, জ্ঞান চাইতে হবে ভগবান শংকরের কাছে— জ্ঞানঞ্চ শংকরাদিচ্ছেৎ, ধর্মবোধ চাইতে হবে তাঁর কাছ থেকে, সেই জন্যই শিব বৃষবাহন, অর্থাৎ তাঁর বাহক হল জ্ঞান, বাহক হল ধর্ম— বৃষো হি ভগবান্ ধর্মঃ— বলা হয়েছে মহাভারতে।

আমরা যেন শিবের গীত গাইতে গিয়ে ধান ভানছি বেশি। তবু শিবের কথা বলতে গেলে তাঁর ত্রিলোচনের কথা যেমন বলতে হবে, তেমনই তাঁর বৃষবাহনের কথাও বুঝতে হবে, তা নইলে লোককাব্যে— বুড়া গোরু লড়া দাঁত ভাঙা গাছ গাড়ু— এমন লীলাতে শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না, কবির সে বোধ ছিল বলেই তিনি এমন সুন্দর রসিক হয়ে উঠতে পারেন। আর এতই সব অঙ্গভঙ্গির কথা যখন শুনলাম, তখন পঞ্চানন শিবের পাঁচ মাথার কথাও একটু শুনে নিই। এখানেও সেই পার্বতীরই প্রশ্ন ছিল। তিনি বলেছিলেন, আগে তোমার চাঁদপানা একখানি সুন্দর মুখ ছিল, কিন্তু এখন তোমার চারদিকে চারখানা মুখ, আবার মাঝখানে উপর দিকে আর একটা তো ভয়ংকর, আগেই আমার ভালো ছিল, ভগবন্ কেন তে বক্ত্রং চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনম্।

শিব বললেন— সে তো এক ঘটনা ঘটেছিল। সেই পুরাকালে ভগবান ব্রহ্মা পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরতম বস্তু থেকে তিল তিল করে নিয়ে সুন্দরী তিলোত্তমাকে তৈরি করেছিলেন। সেই অসামান্যা সুন্দরী তিলোত্তমা আমাকে বেশ প্রলুব্ধ করেই আমার চারদিকে ঘুরতে লাগল— প্রদক্ষিণং লোভয়ন্তী মাং শুভে রুচিরাননা। সেই তিলোত্তমা যেদিক দিয়েই আমার কাছে আসতে আরম্ভ করল, সেই দিকেই আমার একটি করে মুখ তৈরি হতে লাগল— ততস্ততো মুখং চারু মম দেবি বিনির্গতম্। শিব লুকোলেন না কিছু। বললেন, তাকে দেখার জন্যই আমার চারদিকে চার-চারটি মুখ আমি যোগবলে তৈরি করলাম— তাং দিদৃক্ষুরহং যোগাৎ চতুর্মূর্তিত্বমাগতঃ। লক্ষণীয়, এখানে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে তিলোত্তমার গল্প শুরু হল বটে, কিন্তু মুহূর্তে গল্প শেষ হতেই শিব বলছেন, আমি পুবের মুখ দিয়ে ইন্দ্রকে শাসন করি, উত্তরের মুখ দিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি। আমার পশ্চিম মুখ সমস্ত প্রাণীর সুখকর। কিন্তু আমার দক্ষিণ মুখ সবচেয়ে ভীষণ, সেই মুখ দিয়েই আমি জগৎ সংহার করি।

এই কাহিনিতে তিলোত্তমার কোনও পরিণতি নেই। কাহিনিতে তাঁর প্রবেশমাত্রেই তাঁর ভূমিকার অবসান ঘটে। তাতেই বোঝা যায় শিবের পাঁচটি মুখ আসলে পঞ্চভূতের প্রতীক। অথবা চারদিকের চারটি মুখ এবং ঊর্ধ্বে একটি— এই 'পাঁচ' ভাবনার মধ্যে আসলে শিবের সেই পরিব্যাপ্ত সব রূপ ধরা পড়ে, যেখানে একদিকে পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতি তাঁর পুরুষাভিমানী শরীরে আবিষ্ট হন, অন্যদিকে ভূতেশ্বর, ভূতনাথ, ভূতাধিপতি শিব কিন্তু শুধুমাত্র ভূত, পিশাচ, প্রেতের অধিপতি হয়ে ওঠেন না, তিনি পঞ্চভূতাত্মক প্রত্যেকটি জীবদেহের অধিপতি হয়ে ওঠেন, ভূতময়ী প্রকৃতির অধীশ্বর হয়ে ওঠেন। কালিদাস কবি তাঁর নাট্যারম্ভে অষ্টমূর্তি শিবের উদ্দেশে যে প্রণাম জানাবেন, তার মধ্যে পাঁচটি মূর্তি হল পঞ্চভূত, আর দু'টি চন্দ্র-সূর্য যাঁরা কাল বিধান করেন, শিব-মহাকালের প্রতীক তাঁরা, আর আছেন যজ্ঞের যজমান— মানে আমরা— প্রতিদিন আমরা জীবনের যজ্ঞ সম্পাদনে ব্যস্ত আছি— পরম শিব আমাদের মধ্যে থেকেই আমাদের যজ্ঞাহুতি গ্রহণ করছেন।

॥ ছয় ॥

আমাদের মহাকবিরা কিন্তু শিবকে পেলে আর এতটুকুও দার্শনিকতার মধ্যে যাবেন না, তাঁরা শিবকে যেমনটি পাচ্ছেন— অহিভূষণ, কৃত্তিবাস অথবা দিগম্বর, কিংবা চন্দ্রচূড়, পঞ্চানন, বৃষবাহন— এই অসাধারণ পার্থিব বিরূপতাগুলিকে কবি-নাট্যকারেরা বিচিত্র কবিতার আধার করে তুলেছেন। সেসব কবিতায় কবিত্বের চাতুরী একদিকে যেমন শব্দের গরিমা তৈরি করেছে, তেমনই মাধুর্য তৈরি করেছে অর্থের, ব্যঞ্জনার। আমাদের কাছে কবিদের তৈরি শিবের রূপই শিবের আসল রূপ, তাতেই তিনি সবচেয়ে লীলায়িত হন, মানবায়িত হন। একজন কবি বলেছেন— আমার কাছে শিব হলেন 'প'-বর্গ, সেই 'প'-বর্গই আমাকে অপবর্গের ফল দেয়। সংস্কৃতে অপবর্গ মানে মুক্তি, নির্বাণ, মোক্ষলাভ। আর 'প' বর্গ মানে আমাদের বর্ণমালার ক-বর্গ, চ-বর্গ ইত্যাদি করে শেষে প-বর্গ, অর্থাৎ প, ফ, ব, ভ, ম। কবি বলেছেন, শিবের এই প-বর্গ-মণ্ডিতা মূর্তিই আমাকে প-বর্গের উলটো অপবর্গ দান করেছে। তাঁর প-বর্গ

boierpathshala.blogspot.com

কীরকম? বলেছেন— 'পার্বতী-ফণি-বালেন্দু-ভস্ম-মন্দাকিনী-যুতা'। অর্থাৎ শিবপ্রিয়া পার্বতীর 'প', ফণিভূষণ শিবের 'ফ', বালেন্দু মানে চন্দ্রকলা, এই শব্দের 'ব', ভস্ম-বিভূষিত শিবের 'ভ', এবং গঙ্গাধর শিবের মাথায় থাকা মন্দাকিনী-গঙ্গার 'ম'। কবি লিখেছেন— শিবের এই 'প'-বর্গ-মণ্ডিতা মূর্তিই আমার কাছে অপবর্গের ফল— প-বর্গ-মণ্ডিতা মূর্তির প বর্গ ফলপ্রদা।

কবিরা সবচেয়ে মজা পেয়েছেন শিবের সংসার দেখে। কবি কালিদাস সমস্ত জগতের অধীশ্বর শিবের সম্বন্ধে লিখেছিলেন— জাগতিক এবং অলৌকিক সম্পদের মূলাধার হওয়া সত্ত্বেও তিনি অকিঞ্চন, দরিদ্র, তাঁর কিছুই নেই। আসলে শিব মূলত যোগী, বৈরাগ্য তাঁর জীবনের অন্যতম অঙ্গ। আর বৈরাগ্য এবং কৃচ্ছ্রতাকে একভাবে তো দারিদ্র হিসেবে ব্যাখ্যা করাই যায়। মজা হল, কবিরা রসিক মানুষ, তাঁর মুক্তিমার্গী বৈরাগ্যের ব্যাখ্যায় যাবেন না এটাই স্বাভাবিক, বরঞ্চ বৈরাগ্য থেকে শিবকে দারিদ্রের কোঠায় নিয়ে এসে তাঁকে যদি স্ত্রী-পুত্রের সংসারের মধ্যে নিয়ে আসা যায়, তবে শিবের দৈব দাম্পত্যজীবনও মানুষের রসনায় রহস্যময় হয়ে ওঠে। এই যে খানিক আগে অর্ধনারীশ্বরের কথা বলেছি আমরা, সে তো ছিল পার্বতীর প্রেম, শিবের প্রতি প্রবল আকর্ষণে তিনি শিবের অর্ধ অঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু এই প্রেমের ভাবনাটাকে একেবারেই অন্যভাবে ভেবেছেন। এক কবি লিখেছেন অন্তরীক্ষলোকে শিব যত বড়ই দেবাদিদেব মহাদেব হন না কেন সংসার-জীবনে শিবের মতো দরিদ্র দেবতার পক্ষে নিজের পেট চালানোই কঠিন ছিল, সেখানে স্ত্রীর পেট চালানো তো আরও কষ্টকর। কাজেই গরিব মানুষের বাড়িতে যেমন স্বামী-স্ত্রী এক থালায় ভাত বেড়ে দুই ভাগ করে খায়, শিব সেখানে দু'টো পেট ভরানোর ভয়ে পার্বতীকে বাম অঙ্গে ঢুকিয়ে নিয়ে দু'টো পেট এক করে নিয়েছেন— উদর-দ্বয়-ভরণ-ভয়াৎ অর্ধাঙ্গাহিত দ্বারঃ।

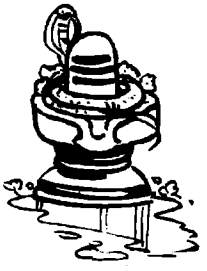

কবি মনে করেন— শুধু এই দুই পেট এক জায়গায় করেই তাঁর দুঃখ শেষ হয়নি, কবি মনে করেন— যে সংসারে নিজের স্ত্রীকে উদর-পূরণের জন্য স্বামীর পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে হচ্ছে, সেখানে তাঁর ছেলে কার্তিক আর বিয়ে করারই সাহস করেননি। শিবের জীবনে অর্ধ অঙ্গ ত্যাগ করে স্ত্রীকে আপন অঙ্গে গ্রহণ করার পিছনে যদি এই দরিদ্রতা না থাকত, তাহলে সারা জীবন বিয়ে না করে রইলেন কেন? যদি নৈবং তস্যৈকসুতঃ কথমদ্যাপি কুমারঃ? আমরা জানি— শিবের পুত্র কার্তিক এমনিতেই কুমার, তিনি বিবাহাদি করেননি, কিন্তু বিয়ে না করার কারণ হিসাবে শিবের এই দরিদ্রতার আবিষ্কার কবি-বৈদগ্ধীর নমুনা।

কবিরা খুব সরসতায় বিচার করেছেন, শিবের দু'টি তিনটি বৈশিষ্ট্য। প্রথমত তাঁর যোগী-স্বরূপ, তাঁর ভস্ম-মাখার স্বভাব আর তাঁর শ্মশানবাস। আর একটা ঘটনা হল— শিবের মৃন্ময় রূপ। এই ঘটনা বাংলার গাঁয়ে-গঞ্জে বহু দেখেছি— বাড়ির ছোট-বড় অনেক মেয়েই মাটি দিয়ে সহজেই একটি শিবমূর্তি তৈরি করে এবং সেই মৃন্ময় শিবমূর্তি পুজোও করে। এই মৃন্ময় শিবকে পুজো করার মাহাত্ম্য কথিত হয়েছে পুরাণে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে। কিন্তু কবির কাছে শিবের মৃন্ময় হয়ে ওঠার কারণ একেবারে অন্য। মানব সংসারের ভয়, ত্রাস মাথায় রেখে কবি লিখছেন— কী অদ্ভুত বিপরীত এই শিবের সংসার। তাঁর পুত্র কলত্রের বাহনগুলিই তাঁর সাংসারিক সমস্যা তৈরি করে দিয়েছে। শিবের গলায় জড়ানো সাপটি সবসময় চাইছে গণেশের ইঁদুরটিকে খেতে, আবার সেই সাপটাকে খেতে চায় কার্তিকের ময়ূর।

আমরা এই স্বাভাবিক বিরোধটার কথা জানি সাপ ইঁদুর খায় এবং সাপকে খায় ময়ূর। কিন্তু এ তবু বাহনে-বাহনে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। মা দুর্গার বাহন সিংহ কিন্তু ইঁদুর, ময়ূর চিবিয়ে জিভ নষ্ট করতে চায় না, সে সোজা নজর দিচ্ছে শিব-পুত্র গণেশের গজমুখটির দিকে। সে সেই হাতির মাথা মুড়মুড়িয়ে খেতে চায়— সিংহো'পি নাগাননম্। আর শিবের বাড়িতে অশান্তিরও শেষ নেই— পার্বতী-দুর্গা সব সময় হিংসে করে যাচ্ছেন সতীন গঙ্গাকে— শিব তাঁকে মাথায় করে রেখেছেন। আর শিবের কপালে যে তৃতীয় নয়নের অগ্নি, তাঁর ইচ্ছে শিবের মস্তকশোভী চন্দ্রের জ্যোৎস্নাটুকু শুষে নেন নিঃশেষে। কবি লিখছেন, নিজের ঘরে এইরকম পরস্পর-বিরোধী কতকগুলি জীবজন্তু, আর সাংসারিক যন্ত্রণা— এইসব সইতে না পেরে শিব যেমন সংসার-বৈরাগ্যে যোগী হয়েছেন, তেমনই সর্বংসহ মাটির মানুষ হয়ে মৃন্ময়ী মূর্তি ধারণ করেছেন— নির্বিণ্ণঃ স শিবঃ কুটুম্ব-কলহাৎ মূর্তিং দধৌ মৃন্ময়ীম্।

বস্তুত এটা কিন্তু আমাদের ঘরের কথা। বিয়ে করার আগে যে পুরুষ, সিংহরাশিতে অবস্থিত হয়ে 'সিংহলগ্ন সিংহবাহু সিংহের হুংকার ছাড়ে', সেই পুরুষই বিয়ের পরে আস্তে আস্তে মেষরাশিতে উত্তরণ করে মাটির মানুষ হয়ে ওঠেন, অর্থাৎ মৃন্ময়ী মূর্তি। সংসারে অনটন নিত্য ডেকে আনে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, কিন্তু তার মধ্যেও এমন স্বামী আছেন কিন্তু যে, যত সামান্য অর্থই তিনি উপায় করুন, তা দিয়েই কেন ভালো খাওয়াদাওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সেই স্ত্রীর কাছেই যিনি মুখিয়ে আছেন অনটনের হিসেব দেবার জন্য। সংস্কৃত কবিতা নয় এটা, কিন্তু মধ্যযুগীয় বাঙালি কবির অল্পবিত্ত শিব স্ত্রীকে শুনিয়ে বলেন, টাকা-পয়সা তো কম আনি না। কিন্তু যায় কোথায় সব— 'সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই।' শিব মনে করেন যে, স্বামী হিসেবে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন, কিন্তু এত টাকা-পয়সা এনেও তিনি বাঘছালটি পালটে এক ভালো ধুতি পর্যন্ত পরতে পারেন না। বাড়িতে এলে একটু ভালো কথা পর্যন্ত জোটে না। সব সময় শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া। ভারতচন্দ্রের শিব বলেন—

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মতো পাইয়াছি চণ্ডী।।
সর্বদা কোন্দল বাজে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায়।।

সংসারের নিয়মে প্রত্যেক স্বামীই ভাবেন— অন্যান্যের স্ত্রীরা খুব ভালো, তাঁর নিজের স্ত্রীটি কপালগুণে অন্যরকম। অন্য ঘরের বউরা স্বামীর সংসারের কত দায় নিচ্ছে, কত গোঁজ দিচ্ছে নিশ্চুপে, শুধু তাঁরই কপাল খারাপ। শিবের জবানে—

আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কতমতে স্বামীর সেবন করে তারা।।
অনির্বাহে নির্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়।।

আসলে আমাদের মধ্যযুগীয় স্বামীদের সংসারচিত্রে সবচেয়ে মানিয়ে যান শিব। একটু যেন বয়স্ক স্বামী তিনি, কিন্তু যুবতী স্ত্রী তাঁর গৃহিণী। অর্থ না থাকলেও তাঁর বার-ফাট্টাই কমে না। তিনি নিজে ভালো খেতে-পরতে চান, আর তাঁর ছেলেপিলেরা লুকিয়ে খায় এবং ভালোই খায়। পার্বতী অনুযোগ করেন, শিবের সঙ্গে ঝগড়া হলে সংসার-চালানোর দায়িত্বে থাকা পার্বতী ছেলেদের কথা বলতে ছাড়েন না। কিন্তু সমস্যা এই যে, ছেলেদের ভাবগতিক ভালো না লাগলেও, তাদের জীবন-যাপনের পদ্ধতিটা মন থেকে এতটুকুও মানতে না পারলেও তাদের সামনে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু তাদের অনুপস্থিতিতে ঘরের চিরশত্রু স্বামীর কাছেই শেষ পর্যন্ত পার্বতী বলে ফেলেন—বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান। সবে গুণ

boierpathshala.blogspot.com

সিদ্ধি খেতে বাপের সমান। আর ছোট পুত্র কার্তিকেয় ছয় মুখে খায়। উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়।।

মানুষের দেহে হাতির মাথা এবং বৃহদাকার ভুঁড়ির অধিকারী গণেশ যে বেশি খাবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিবের সংসারে যে অনটন চলে তার নিরিখে এই স্বাভাবিক ভোজন নিয়ে গণেশকে যেমন দুচ্ছাই করা যায় না, তেমনই কার্তিক মানেই তো ফুলবাবু গোছের লোক, বাপের টাকা ময়ূর-বাহনের পিছনেই চলে যায় তাঁর। আবার মধ্যযুগীয় সাহংকার স্বামীটির মতো শিবের অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা না থাকলেও তিনি পার্বতীর সঙ্গে পাশা-দাবা খেলতে বসেন বাজি ধরে। এমন জুয়োখেলায় পার্বতীও শামিল হন। আমাদের কিন্তু জানা বিষয় এগুলি, তবে কিনা গণেশের সঙ্গে হাতির যোগসূত্র ধরেই তাঁর খাবার জোগানোর ভাবনা, ময়ূরের মতো একটা অতিসুদর্শন প্রাণীর অধিকারিতার সূত্র ধরেই কার্তিকের টাকা ওড়ানোর ভাবনা এবং পুরাণগুলির মধ্যে হর-পার্বতীর গভীর প্রণয়ের সূত্র ধরেই পাশা-দাবা খেলার ঘটনাকে শিবের সংসার-দুঃখের কটিতে নিয়ে আসাটা কবিত্বের চাতুরী। সেই চাতুরী সৃষ্টি হয়েছে আরও একটা অদ্ভুত সূত্রে এবং তিনি হলেন নন্দী-ভৃঙ্গীর ভৃঙ্গী। শিবগণের মধ্যে অতিবিখ্যাত নন্দী-ভৃঙ্গীর মধ্যে ভৃঙ্গী এমনিতেই কিছু রোগা মানুষ। কবি কিন্তু তাঁকেই ধরে তাঁর দৃষ্টিতে শিবের সংসার নিরীক্ষণ করছেন।

ভৃঙ্গী নাকি শিবের সাংসারিক অবস্থার কথা ভেবে দিন-দিন আরও রোগা হয়ে যাচ্ছে। সে এটাও ভাবছে যে, এইভাবে চললে এই বাড়িতে আর তার চাকরি বেশিদিন থাকবে না, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পুষতেই যার অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠছে, সে কাজের লোক রাখবে কী করে—দেবঃ কথং পৌক্ষ্যতি/ ইত্যালোচ্য বিশুষ্কপঞ্জরতনুঃ—ভৃঙ্গী এসব ভেবেই রোগা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, কিন্তু বাড়ির কাজ করলেও ভৃঙ্গী বহুকালের ভৃত্য, শিবের সংসার এবং শিবের সাংসারিক চালচলন দেখে তার রাগ যেমন হয়, তেমনই মনে হয় যে, তার মনিব অন্যভাবে ভাবলেও তো কিছু অন্যরকম হতে পারত। ভৃঙ্গী ভাবে—যে বাড়িতে গৃহকর্তার গৃহিণীরই ভাত জোটে না, অথচ তার দুটি ছেলের খাওয়া-দাওয়ার বিরাম নেই, সে বাড়িতে গৃহকর্তা এতগুলি মুখে অন্নের জোগান দিয়ে শেষপর্যন্ত আর ভৃত্যের ভরণ করবেন কী করে? ভৃঙ্গী মনে মনে প্রভু শিবের কথা ভেবে স্বগতোক্তি করে—আচ্ছা মালিকের পাল্লায় পড়েছি আমি! লোকটা তো আমারই মতো গতর খাটিয়ে লোকের বাড়িতে কিংবা রাজবাড়িতে কাজ করলেও পারে, তা করবে না। ঠিক আছে, লোকের বাড়িতে পরাধীন কাজ না করতে চাইলে চাষ করো, তাও পারবে না; অলস তো, গতর নাড়াবে না। গতর নাড়াতে ইচ্ছে না করে তো বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে পারে, তাও করতে পারবে না, সে মুরোদ নেই—সেবাং ন কুরুতে করোতি ন কৃষিং বাণিজ্যমস্যাস্তি ন।

শিবকে দিয়ে চাষবাস করানোর পরিকল্পনাটা মাঝে-মাঝেই কবিদের ওপর পড়েছে। হয়তো বা সংস্কৃত কবির পৌরাণিক ভাবনা সম্বল করেই শিবের দারিদ্র-দুঃখ মোচন করার জন্য ভারতচন্দ্রের অন্নদা পার্বতী শিবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন—বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস/ তাহার অর্ধেক চাষ। কিন্তু এ-ব্যাপারে শিব উদাসীন ছিলেন এবং নিজের মতো করে একটা অজুহাত দিয়েও বলেছিলেন যে, এখন বুড়ো হয়েছি, আর চাষবাস করার ক্ষমতা নেই—বৃদ্ধকাল আপনার/ নাহি জানি রোজগার/ চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।

আমাদের পূর্বোক্ত শ্লোকে ভৃঙ্গী যেমন তার মালিকের দোষ দেখেছে, তেমনিই তার মালকিন পার্বতীর দোষও লুকোয়নি। ভৃঙ্গী ভাবে—সংসারের এই অকূল অবস্থা, অথচ এর মধ্যেও বাবুয়ানি কম নেই দুজনের, দুজনে বসে বসে বাজি ধরে পাশা খেলছে। আর তাস-পাশার নেশার সঙ্গে শিবের স্ত্রৈণতাও কম নয়, সব সময় স্ত্রীর আঁচল ধরে বসে আছে—দ্যূতস্ত্রীব্যসনং ন মুঞ্চতি। ভৃঙ্গী মনে করে—শিব যে সমস্ত লজ্জা ঠেলে পার্বতীর মোহে তাঁকে আপন দেহে আত্মসাৎ করেছেন এবং অর্ধনারীশ্বর হয়েছেন—এটা শিবের স্ত্রৈণতারই ফল। শিবের এই স্ত্রৈণতার জন্য এখন ভৃঙ্গীর ভয় হয়—যেভাবে এক স্ত্রী তাঁর মনিবের অর্ধ অঙ্গে জুড়ে বসেছেন, তাতে তাঁর আর এক স্ত্রী গঙ্গা যদি তাঁর হিংসা মেটাতে টুপ করে মাথা ছেড়ে নেমে পড়েন গায়ের ওপর, তাহলে শিব গোটাটাই স্ত্রীলোক হয়ে যাবেন, তাঁর আর অস্তিত্ব থাকবে না—তস্যার্ধং কুপিতা হঠাদ্ যদি হরেন্মূর্ধ্নি স্থিতা জাহ্নবী—এই অবস্থায় কাজের লোক হিসেবে ভৃঙ্গী কী করবে কোথায় থাকবে—এইসব ভেবে-ভেবেই রোগা হয়ে যাচ্ছে ভৃঙ্গী—ইত্যালোক্য বিশুষ্ক-পঞ্জরতনুঃ।

পরম শিবকে দেবতার মহামঞ্চ থেকে নামিয়ে এনে তাঁকে এই রকম হাস্যরসের নির্মল নায়ক করে তোলার ব্যাপারে অনেক কবিরাই ষড়যন্ত্রী ছিলেন। কেন না শিবের মতো বিচিত্র-আভরণে পুষ্ট একটা বিষয় পেলে কবিদের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভবই নয়। শিবের গায়ে যে ভস্ম মাখা থাকে, তার দার্শনিক গূঢ় তাৎপর্য যাই থাক, কবির কাছে সেটা 'ঠেলার নাম বাবাজি'র নামান্তর। আমার কৈশোর-যৌবনে এইরকম ঠ্যালায় পড়া বাবাজি আমি অনেক দেখেছি। অর্থাৎ কিনা, চাকরি-বাকরি করতে পারে না, স্বাধীন ব্যাবসা-বাণিজ্য করার ক্ষমতা নেই, অথচ বিয়ে করার শখ আছে, কিন্তু ছেলেপিলে মানুষ করার ক্ষমতা নেই—এই অবস্থায় মানুষের একটা মর্কট বৈরাগ্য আসে। অথচ তার যে ধর্মে-কর্মে, মোক্ষানুসন্ধানে খুব রুচি আছে, তা কিন্তু মোটেই নয়, কিন্তু এই অবস্থাতেও সংসার-কর্মে এতটুকুও উদ্‌যোগ না দেখিয়ে শুধু নিজের ভাত-কাপড় জোগাড় করার জন্য কেউ কেউ মাঠে-মন্দিরে গিয়ে বাবাজি হয়। আমার কবি মনে করেন যে, শিব ঠিক বৈষ্ণবীয় মতে রসকলি দিয়ে বাবাজি হননি বটে, কিন্তু শৈব মতে ভস্ম মেখে শ্মশানবাসী হয়েছেন।

এমনিতে শিবের গায়ে ভস্ম মাখার কারণ কিন্তু অন্য। রুদ্র শিব প্রধানত অগ্নির প্রতীক, অগ্নি যেমন বর্জ্য-অবর্জ্য সব পদার্থই জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়, তেমনই জ্ঞানাগ্নিও জাগতিক দুঃখ-সুখ নষ্ট করে দিয়ে সাধককে সত্য-শিব-সুন্দরের পথে নিয়ে যায়। এই কারণেই অগ্নির দাহন-পরিণাম ভস্ম শৈব সাধনার প্রতীক এবং তা শিবেরও অঙ্গভূষণ। আমার কবি রসিকতা করে বলেছেন—শিবের ভস্ম মেখে শ্মশানবাসী হবার কারণ একেবারেই অন্য। তিনি মনে করেন—শিবের স্ত্রীভাগ্য এবং পুত্রভাগ্য দুই-ই খুব খারাপ। তাঁর এক স্ত্রী দুর্গা-পার্বতী-চণ্ডী—তিনি বড়ই যুদ্ধবাজ। মাঝেমাঝেই তাঁকে অসুর মারতে বেরতে হয়—এই মহিষাসুর, এই চণ্ড-মুণ্ড, এই শুম্ভ-নিশুম্ভ— তাঁর যুদ্ধের শেষ নেই; যুদ্ধ করতে করতে ঘরেও তিনি রণচণ্ডী হয়ে থাকেন—একা ভার্যা সমর-রসিকা। আর দ্বিতীয় ভার্যা—সে আর এক রকম, সব সময় সে নীচে নামছে। এই কথাটার মধ্যে নদী-চরিত্রের সঙ্গে স্ত্রীচরিত্রও জুড়ে গেছে। পণ্ডিতেরা দু-কূল-ভাঙা নদীকে কুলটা নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, তাই এখানে 'নিম্নগা' শব্দটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ—অর্থাৎ কিনা গঙ্গাধর শিব গঙ্গাকে মাথায় করে রাখলেও তাঁর গতি কেবলই নীচের দিকে। খেয়াল করতে হবে যে, গঙ্গার সঙ্গে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার সঙ্গে সম্পর্কও কিছু কম নয়। অথচ তিনি শিবের স্ত্রী বলে পরিচিত। কবি এই দিকটাই খেয়াল করে লিখেছেন—তাঁর অপর স্ত্রীটি শুধুই নীচের দিকে নামেন—একা ভার্যা সমররসিকা

boierpathshala.blogspot.com

নিম্নগা চ দ্বিতীয়া।

শিবের পুত্রভাগ্য এবং ভৃত্যভাগ্যও খারাপ। এই যে দুটো ছেলে, তাদের চেহারাটা কী, বড় ছেলের মুখটা দ্যাখো, হাতির মতো; আর ছোট ছেলে কার্তিকের ছ'টা মাথা, তিনি ষড়ানন। ঘরের ভৃত্য, চাকর-বাকরও সেইরকম—নন্দী-ভৃঙ্গীর মুখ দুটি বাঁদরের মতো। আর বাহনের কথা না বলাই ভালো—ব্রহ্মার হংসবাহন, বিষ্ণুর গরুড়, কিন্তু আপন পুত্র কার্তিকের ময়ূরের তুলনায় শিবের ষাঁড় এতই বেশি বিপ্রতীপ এবং জঘন্য যে, সংসারের পুত্র-ভৃত্য-কলত্র-বাহনের চরিত্র এবং বিরূপতা সহ্য করতে না পেরেই শিব শেষ পর্যন্ত গায়ে ভস্ম মেখে যোগী হয়েছেন—স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং ভস্মদেহো মহেশঃ।

সহৃদয় পাঠক আমার! আপনারা বুঝি বিরক্ত হচ্ছেন—আমি আমার কবিদের কথা এত বলছি বলে। আসলে শিবের চেহারা বসন-ভূষণ এবং আত্মভোলা চরিত্র এমনই মধুর যে, আসল দৈব চেহারাটার মধ্যেই যেন কবিদের অনন্ত সংলাপ মেশানো আছে। ফলে একদিকে যেমন তাঁর স্তব-স্তুতি করার সময় অনন্ত কল্যাণ-গুণ তাঁর মধ্যে আরোপিত হয়—প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং/জগন্নাথ- নাথং সদানন্দভাজম্— তেমনই তাঁর বিচিত্র যোগী-বৈরাগী জীবনের মধ্যে 'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারি'-র যত ছটা কবিদের গায়ে লেগেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁরা মাথা ঘামিয়েছেন আরাধ্য-দেবতার চারিত্র-কৌতুক নিয়ে। শিব-মহাদেবের মতো নটরাজ তাণ্ডবীকে দুই সতীন-কাঁটার মাঝখানে রেখে বিব্রত করা থেকে আরম্ভ করে তাঁকে একটু বৃদ্ধ করে তোলা, কোনওদিকে তাঁর হুঁশ নেই, তালতোল নেই, খানিকটা জবুথবুভাবে তাঁকে ভাসিয়ে তোলা—এগুলি আমাদের কবিদের সমাজ-সাধক দার্শনিক করে তুলেছে।

শিবের এই লীলায়িত এবং কাব্যায়িত চরিত্র বুঝতে হলে সেই বাঙালি মধ্যযুগের বিভ্রান্ত পুরুষদেরও বুঝতে হবে। তখন রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদেশি শাসন চলছে, অন্যতর ধর্মের প্রয়োগ ঘটছে সুকৌশলে রাজদরবারে চাকরি জোটে স্তাবক পুরুষের এবং স্তবের মধ্যেও রাজভজনার প্রয়োজন ছিল। এই সমাজ-পুরুষদের অন্য পাশে তাই আরও একটা পুরুষ সমাজ গড়ে উঠছিল যারা চাকরি করতে পারছে না, কিন্তু সামান্য জমিজিরেত নিয়ে জীবন-জীবিকাও চলছে না। অথচ পুরুষের গুমোরটুকু আছে, তারা বিয়ে-থাও করছে দুটি কি তিনটি পৌরুষের প্রমাণ সাধনের জন্য। তারপর সন্তান-সন্ততি, সংসারে অনটন এবং ফ্রাস্টেশন। এই সমাজটা কবিদের সম-সময়ের। আমাদের কবিরা বিচিত্র শিবকে এই সমাজের মধ্যে 'প্রোজেক্ট' করছেন বলেই শিব এবং শিবচরিত্র তাঁদের সমাজ-দর্শনের সাধক হয়ে উঠছে এবং এখানে শিবকে একেবারে বেইজ্জৎ করে ফেলতেও তাঁদের বাধছে না। চালচুলো নেই এমন শিবের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় না মেয়ের বাবা—এটা তো আমরা পুরাণের শ্লোকেই পেয়েছি। শিবকে দেখে মা মেনকা বলেছিলেন—হতচ্ছাড়ি মেয়ে আমার! কী বর পছন্দ করেছে দ্যাখো সবাই—বরশ্চ কীদৃশো লোকে লব্ধশ্চ দুষ্টয়া পুনঃ। কী দেখে এই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব আমি—কিং বিলোক্য ময়া পুত্রী দীয়তে কিং করোম্যহম্!

কিন্তু দেখুন, দ্বিজ কালিদাসের সময়। কৌলীন্য প্রথায় বহুবিবাহ তখন ঘিরে ধরেছে সমাজকে। সেখানে ভালো ঘরের সুন্দরী মেয়ে দেখে শিব হিমালয়কে বলেন—দেখে তব গৌরী কন্যে/জামাই হবার জন্যে/তব পুরে হইল আগমন। কিন্তু বড়লোক শ্বশুর হিমালয় ছেলের ভাবগতিক সহ্য করতে পারছেন না। শিবের কথা শুনে রাগে তাঁর গা কাঁপছে। তিনি কাজের লোককে বলছেন—মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে এরে/ধাক্কা মেরে করহ নির্গত। শিব কিন্তু এখানে দমবার পাত্র নন। মেয়ে-বিয়ের জন্য বাজারে পুরুষের চাহিদা আছে, সে-কথা এই শিব জানেন। ফলে একটু রসিক হয়েই তিনি ভাবী-শ্বশুর হিমালয়কে বলেন—'কিবা ভিক্ষা দিবে গিরি/ অন্য ভিক্ষা উপজীবী নই।' তুমি মেয়েটাকে দাও আমার হাতে—'মর্মদুঃখে তব শাম্য হই।' হিমালয় এবার বুঝতে পারেন যে, শিবের এই অসংযত ব্যবহারের পিছনে তাঁর মেয়েও জড়িত। তিনি আরও রেগে যান শিবের ওপর। 'বলে বেটা এত জোর/এক চড় মেরে তোর/ কাঁথা বাঘছাল কেড়ে লব। শিব এখানে বেপরোয়া, পূর্বাহ্নেই, পার্বতীকে মজিয়ে ফেলার ফলে তাঁর ভাষা এখানে বাঁধনহীন, লজ্জাহীন। 'হাসি বলে ত্রিপুরারি/ শুন শুন শুন গিরি/ কাঁথা ঝুলি সব তুমি লয়,/ইহা আমি নাহি চাই/ কেবল হব জামাই/ মম বামে গৌরীরে বসায়ে ॥

দেখুন, দ্বিজ কালিদাসের এই শিব কিন্তু তাঁর সময়ের অনুপাতে গড়া। পৌরাণিক কবি কিন্তু এত দূর যেতে পারেননি। কেন না তাঁর কাছে শিবের অতিলৌকিক স্বভাবটার মধ্যেই এক সার্বিক অনাসক্তি আছে, বৈরাগ্য আছে। কিন্তু এই বৈরাগ্য যেহেতু আর একভাবে সংসারের কোনও দিকে না তাকানোও বোঝায়, এমনকী এতটাই নির্বিকার নির্বিঘ্ন সেই ঈশ্বর-স্বভাব, যেটাকে আত্মভোলা বোকা-বোকাও ভাবা যায়, তাই সংস্কৃতের কবি শিবকে ব্যবহার করেন ভারতীয় মধ্যবিত্তের বৈবাহিক মধুরতা প্রমাণের জন্য। এমনিতে শিব তো দিগম্বর, তিনি নগ্ন সন্ন্যাসী। কিন্তু তাঁর বিয়ে হবে বলে কী না করছেন এখন, নগ্নতা ত্যাগ করে তিনি এখন ভালো জামা-কাপড় পরছেন। এখন আর গায়ে ভস্মটস্ম মাখেন না, একটু চন্দন-কুঙ্কুমের প্রলেপ লাগাচ্ছেন এখন। আর যত্রতত্র শ্মশানে-মশানেও ঘুরে বেড়াচ্ছেন না, একেবারে শ্বশুরবাড়ির গা-ঘেঁষেই বাসা নিয়েছেন কৈলাসে। কবি লিখেছেন—এমন যে গৃহস্থ শিব, যিনি শৈলসুতা পার্বতীকে বিয়ে করে এমন ভদ্রলোক হয়েছেন, এই শিব তোমাদের বাঁচিয়ে রাখুন সবাইকে—দেবঃ পাতু হিমাদ্রিজা-পরিণয়ং কৃত্বা গৃহস্থঃ শিবঃ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আমার এই কবির ঘরে অবশ্যই সেই বাউণ্ডুলে ছেলেটি ছিল, যে বিয়েথা করতে চায়নি এবং অদ্ভুত স্বেচ্ছাচারে জীবন কাটাত। এমন ছেলে সংসারি হয়েছে বলে কবি কিন্তু ভাঙা-গড়ার জন্য শিবকেই বেছে নিয়েছেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে নয়। কিন্তু বাস্তবে শিবের যে এমন উন্নতি কখনও হতে পারে না। বড় জোর বিয়ে করার জন্য তিনি নগ্নতার ওপর আবরণ দিয়ে গজেন্দ্রকৃত্তিটি পরতে পারেন অথবা বাঘছাল, এর চাইতে বেশি নয়—এই কথাটা বোঝানোর জন্য অন্যতর কবির রসিকতা হল—কৃত্তিবসন পরাটাও তাঁর ভালো করে অভ্যাস নেই, পরলেও সেটা ধরে রাখতে পারেন না তিনি। বিয়ের আসরেও যে সেই অঘটন যে ঘটতে পারে, ভারতচন্দ্র সেই কল্পনাটা অবশ্য ধার করেছেন এক সংস্কৃত কবির কাছ থেকেই।

আমাদের সেই প্রাচীন কবিদের কল্পনায় শিবের একটা তাৎক্ষণিক অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি গলায় ঝোলা সাপটিকে মাঝে মাঝে জটা বাঁধার কাজে লাগাতেন, আবার দরকার পড়লে ওই সাপ দিয়েই তিনি গজাজিনের কৃত্তিটুকুও বেঁধে ফেলতেন 'বেল্টে'র মতো করে। আমরা মহাকবি কালিদাসের লেখাতেই তপস্বী শিবকে দেখেছি সর্পের বন্ধনরজ্জু দিয়ে জটাগাছি উঁচু করে বেঁধে নিয়েছেন মাথার ওপরে। কিন্তু সেই সর্পবন্ধনীতে কৃত্তিবাসখানি বেঁধে নিয়েছিলেন বলে অন্য কীর্তি করে

boierpathshala.blogspot.com

ফেলেছিলেন তিনি. সে কথা লিখেছেন এক সংস্কৃত কবি। তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন যে, একবার নাকি ভগবান বিষ্ণু দেখা করতে এসেছিলেন শিবের সঙ্গে। শিব বিষ্ণুকে খুব ভালোবাসেন আবার শ্রদ্ধাও করেন। ফলে তাঁর আগমনের খবর পেয়েই একটু ভদ্রসভ্য হবার চেষ্টায় শিব সর্পবন্ধনীতে ভালো করে কোমরে আটকে নিলেন তাঁর গজকৃত্তির বসনখানি। তিনি তারপরেই দৌড়লেন বিষ্ণুকে প্রত্যুদ্গমন করে নিয়ে আসার জন্য। বিষ্ণুর রথের সামনে এসে দাঁড়াতেই রথের ধ্বজে বসা গরুড়কে দেখে কোমরে বাঁধা শিবের সাপ মৃত্যুর ভয় পেল। কেন না গরুড় বৈনতেয় সাপেদের চিরশত্রু, তাঁকে দেখলে পরেই সাপেরা পালাতে থাকে। এখানেও তাই হল. গরুড়কে দেখেই শিবের সাপ কটিবন্ধ থেকে ঝপাৎ করে পড়ে গেল মাটিতে—দৃষ্ট্বা বিষ্ণুরথং সকম্প-হৃদয়ঃ সর্পো'পতদ্ভূতলে। এবারে যা হবার তাই হল। শিবের কৃত্তিবসনও খসে পড়ল মাটিতে। তিনি নগ্নাবস্থায় একেবারে জড়সড় হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন বিষ্ণুর সামনে।

ঘটনা এইটুকুই ছিল। কিন্তু সর্পকুলের এই ভয়ভীতির সূত্র ধরে ভারতচন্দ্র শিবকে একেবারে বিবাহবাসরে নিয়ে এসেছেন। পুরাণে দেখেছি—শিবের সঙ্গে বরযাত্রীরা এসেছেন শিবের আগে আগে। মেনকা এক-একজন দেবতাকে অপূর্ব বেশবাসে মহার্ঘ্য অলংকারে দেখছেন, আর তাঁকেই পার্বতীর হবু বর ভেবে বড়ই উৎফুল্ল হয়ে নারদকে জিজ্ঞাসা করেছেন—ইনিই কী, ইনিই কী...? নারদ অত্যন্ত তুচ্ছতায় সেইসব দেবতা শিবের তুলনায় নিতান্ত গৌণ জায়গায় স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে মেনকার আশা বাড়তে থাকে জামাইকে ঘিরে। অবশেষে হতাশ হলেন জামাইকে দেখে। কিন্তু যেমনই হোক, সে-ই তাঁর মেয়ের পছন্দ, তাঁকে বরণ করে তুলতেই হবে, বসাতে হবে বরাসনে। ঠিক এই জায়গা থেকে সূত্র গ্রহণ করে ভারতচন্দ্র দেখাচ্ছেন—পার্বতীর মা বরণ করতে এসেছেন জামাইকে আর ওদিকে বরযাত্রী হিসেবে বিষ্ণুর মনে হল একটু রঙ্গ-তামাশা করলে কেমন হয়। তিনি নারদকে বললেন একটু গোলমাল লাগাতে এবং সে গোলমালের সূত্র করলেন তিনি নিজেই। ভারতচন্দ্র লিখছেন—

কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিলা কোন্দল লাগাইতে ॥
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া।
শিব-কটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া ॥
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনি ডালা হুলাহুলি দিয়া ॥
বরের সম্মুখে মাত্র মেনকা আইলা।
পালাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা ॥
গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিলা গিয়া।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া ॥
বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হইল হর।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর ॥
মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা ॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই ॥
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥

আসলে শিব নগ্ন, নাকি সামান্য কৃত্তিবাসী কৌপীন তাঁর পরিধানে আছে, শিবের মহত্ত্বের বিচার কিন্তু এটা দিয়ে হয় না। এমনিতেই তিনি নানান বৈপরীত্যের বিলগ্ন সমাহার, তাঁকে বিচার করতে হয় দার্শনিক কঠিনতা দিয়েই। কিন্তু কোনও দেবতাকেই আমরা যেহেতু তাঁদের একান্ত অদ্বৈত প্রকোষ্ঠের মধ্যে শুধু ধ্যানগম্য কিংবা জ্ঞানৈকলভ্য হয়ে থাকতে দিইনি, তাই শিবকে নিয়ে আমাদের কৌতুক বেড়েছে চিরকাল। এমনকী বলব যে, কৌতুকের সীমা ছাড়িয়েও গেছে কখনও কখনও।

বস্তুত শিবই বোধহয় আমাদের সেই প্রাণের দেবতা, যিনি সমস্ত দেবতাকুলের মধ্যে কবিজনোচিত ভাঙাগড়ার চরম বিষয় হয়ে উঠেছেন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তার একটা শেষ উদাহরণ দিয়ে আমরা শিব-বিষয়ক কবিকল্প শেষ করব। আমরা সবাই জানি যে, সিদ্ধিদাতা গণেশ শিবের ছেলে এবং তিনি রুদ্রগণের প্রায় প্রতিরূপ। তাঁর বিদ্যেবুদ্ধি, জ্ঞান, গরিমা কোনওটারই অভাব নেই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে কবিরা কম রসিকতা করেননি এবং ময়ূরবাহন কার্তিককে নিয়েও বাবুয়ানির উদাহরণ কম নেই। কিন্তু গণেশ শুধু গজানন বলেই তাঁর মধ্যে নির্বুদ্ধিতার বিকার দেখেছেন কেউ কেউ। আর কার্তিকের মতো কুমার-দেবতাকে নিয়ে ফুলবাবুর ভাবনাও কবিরাই করেছেন। ঠিক এই জায়গায় আমরা বাবু-কালচারের প্রধান গায়েন রূপচাঁদ পক্ষীর বক্তব্য উদ্ধার করব। ইংরেজ শাসনের সেই কালে ইংরেজি-বিদ্যার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, বিএ/এমএ পাশের কদর বেড়েছে তখন। ঠিক এই প্রেক্ষিতে গাঁজা-ভাঙ খাওয়া শিবের দুই উপযুক্ত পুত্র কেন পিতার সংসারের গতি ফেরায়নি, সেই বিষয়ে রূপচাঁদ পক্ষীর আক্ষেপ—গানটা কিন্তু পুজোর কালে আগমনি—

মেনকা গো শোন তোর অম্বিকার দুর্গতি।
গাঁজা টেনে শ্মশানে যায় পশুপতি ॥
মাঠে ঘাটে বেড়ায় ছুটে কার্তিক-গণেশ দুই নাতি ॥
শৈশব হতে যদি শেখাতে দুটিরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা আসিত পাস করে,
অনায়াসে দুটিতে বিদ্যাবুদ্ধির জোরে হত হাইকোর্টের বিচারপতি ॥
যত হট্টের সঙ্গে শিখেছে হট্টতা, কীরূপে তাহারা শিখিবে সভ্যতা,
অসিদ্ধ বালকের নাম সিদ্ধিদাতা, কলাবৃক্ষ যার সঙ্গতি ॥
(দেখ) সংসর্গদোষেতে তোর দশভুজা, চণ্ডালের গৃহেতে লয় অগ্রে পূজা,
ভোলা মহেশ্বর দিন-রাত টানে গাঁজা, সঙ্গে সব আবাগের সন্ততি ॥
কহে দীন দ্বিকর জুড়ে ইঁদুরে, ময়ূরে দুটি শিশু চড়ে,
মাতঙ্গীর সিংহ, বুড়োর বুড়ো এঁড়ে, কে দিবে গো ঘোড়া হাতি ॥

অলংকরণ: ইন্দ্রনীল ঘোষ

সমাপ্ত

boierpathshala.blogspot.com

সমাপ্ত

boierpathshala.blogspot.com